C/TU
4th Conference

11-15 April
1979
Madras

Bengali
Pdf

সেণ্টার অব্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্

সর্বভারতীয় চতুর্থ সম্মেলন

●

সভাপতির ভাষণ

ও

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

●

মাদ্রাজ

১১-১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯

সভাপতির ভাষণ

কমরেড বি. টি. রণদিভে

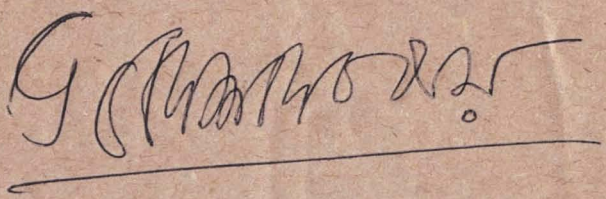

কমরেডস, ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং সর্বভারতীয় সি, আই, টি, ইউ সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

বোম্বাইয়ে সি, আই, টি, ইউ-র বিগত সম্মেলনের পর ও বর্তমান সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক মূল্যবান কমরেডের চিরপ্রয়াণ লক্ষ্য করতে হয়েছে।

সেই বিখ্যাত যোদ্ধা এবং সি, পি, আই (এম)-এর নেতা, সর্বভারতীয় কিষাণসভার প্রিয় সভাপতি, কমরেড এ, কে, গোপালন আমাদের মধ্যে নেই।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক নেতা কমঃ মাও সে তুং; চৌ এন-লাই এবং অন্য অনেকের তিরোধান ঘটেছে। কমরেডস, এই সময়ের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য এবং বিশ্ব কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক কমরেড শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। এঁদের অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন চিলির সেই বীর যোদ্ধাগণ যাঁরা ফ্যাসিস্ত চক্রের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করেছেন; একই মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস দেখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের উন্মাদ উদ্গাতাদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি প্রয়াত নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কমরেডস, আমরা সকলে ইন্দিরা প্রবর্তিত জরুরী অবস্থার বীভৎস দিনগুলিতে কারান্তরালে যাঁরা অত্যাচারের মুখে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি; এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, কর্মচারী ও অন্যরা যাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলির শিকার হয়েছেন তাঁদেরকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

কমরেডস, আপনাদের স্মরণ আছে যে বিগত বোম্বাই সম্মেলনে আমরা সকলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের অমর জনগণের শেষ বিজয় কী আনন্দের সংগে অভিনন্দিত করেছিলাম; এবং আপনাদের স্মরণ আছে আমরা ভিয়েৎনামের জনগণের প্রতি চীনের জনগণের মূল্যবান সাহায্যদানকে সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছিলাম।

আজ সেই ভিয়েৎনামের জনগণ, যাঁরা এশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার

চক্রান্তকে এককভাবে মোকাবিলা করেছিলেন, তাঁরা গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীনের সৈন্যবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত। একটি ছোট্ট দেশের জনগণের উপর এক বিরাট দেশের এই আগ্রাসী আক্রমণকে নিন্দা করবার উপযুক্ত ভাষা, সে যত তীব্র এবং রূঢ়ই হোক, খুঁজে পাওয়া যায় না। যে আক্রমণকে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি যুক্তিযুক্ত বলছে এবং সমর্থন করছে, আমরা সেই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করি। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এটা তাদের স্বার্থের অনুকূল। আমরা সকলে এই মুহূর্তেই ভিয়েৎনামের মাটি থেকে চীনা সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার দাবি করছি।

আমরা ভিয়েতনামের জনগণকে আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে আমাদের সহানুভূতি ও সমর্থন জানাই এবং এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে যাঁরা আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, তাঁরা বর্তমান পরীক্ষায়ও বিজয়ী হবেন।

আমি সেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে অভিনন্দন জানাই যাঁরা অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জনগণের জীবনকে সমৃদ্ধ করে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। দারিদ্র্য, বেকারী, অর্থনৈতিক সংকট কণ্টকিত পুঁজিবাদী দুনিয়ার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এক বিপরীত চিত্র তুলে ধরে।

সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার যথেষ্ট বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও, ১৯৭৩-৭৪ সালের যে অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কা পুঁজিবাদী দেশগুলি এখনও কাটিয়ে ওঠেনি তা পুঁজিবাদের মৌলিক দুর্বলতা ও অস্থায়িত্ব প্রকাশ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চমূল্য, মজুরী সংকোচন, উচ্চ কর এবং বেকারীর বোঝার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের সব বোঝাই বইতে হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে রক্ষা করতে এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির কুফল থেকে বাঁচাতে, দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই সংগ্রামে আমরা তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

আমি এশিয়া ও আফ্রিকার সেইসব দেশ ও জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যাঁরা কয়েক বছর আগে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন; এবং কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতকায় সংখ্যালঘুদের বর্ণবৈষম্য ভিত্তিক প্রভুত্বকামীদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদেরও অভিনন্দন জানাই। এই সব সংগ্রামে সংগ্রামী জনগণ বিরাট আত্মত্যাগ বরণ করে নিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফ্রিকার জনগণ এক অভূতপূর্ব নতুন সাহস ও আত্মত্যাগের নজীর সৃষ্টি করেছেন। সাম্য ও স্বাধীনতার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যুবক ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সর্বস্ব ত্যাগের এ এক অভূতপূর্ব কাহিনী।

সাম্রাজ্যবাদ

পুঁজিবাদী দুনিয়ার দৃঢ়মূল অর্থনৈতিক সংকট ও বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির পশ্চাৎপদতার পরিবেশে উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এক পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে মারণাস্ত্র পুঞ্জীভূত করে চলেছে। সম্পদকে মানবজাতির ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত করে রাখার চেয়ে হীন কাজ আর কিছুই হতে পারে না। এই জন্য আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার বিরামহীন সংগ্রামকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তিসংস্থার অন্তর্গত দেশগুলির সামরিক শক্তি বিশ্বশান্তি রক্ষার সমর্থনে এক শক্তির উৎস এবং যাঁরা তাঁদের ন্যাটো চুক্তির দেশগুলির সমপর্যায়ে ফেলেন তাঁদের নিন্দা না করে পারা যায় না। যদিও আমরা শান্তির জন্য আলাপ-আলোচনাকে সমর্থন করি তবু আমরা মনে করি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আলাপ-আলোচনা এবং বিশ্বশান্তির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী নয়।

কমরেডস, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিক ঘাঁটি সংগঠনে এবং নয়া উপনিবেশিক চক্রান্তের ব্যাপারে খুবই সক্রিয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিভাগকে—চীন-সোভিয়েট অন্তর্দ্বন্দ্বকে—চূড়ান্তভাবে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এরা আরব ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে এবং মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে বোঝাপাড়ার অন্তরালে ইস্রায়েলকে নির্লজ্জ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। এরা রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ত সরকারকে সমর্থন করে চলেছে। এরা নির্লজ্জভাবে ইয়োরোপের দেশগুলির নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে। ইটালিতে যাতে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারে না যেতে পারে তারজন্য হস্তক্ষেপ করেছে। এরা কপটতার সংগে মানবাধিকার রক্ষা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে এবং সেই সঙ্গেই নিজেদের নিগ্রো সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এরা বহু দেশে সামরিক একনায়কত্বকে সমর্থন করে—চিলি যার একটি উদাহরণ—এবং অনুন্নত দেশগুলিতে একনায়কত্বে বিশ্বাসী সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে যায়।

এরা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের Non Proliferation treaty চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য এবং পারমাণবিক উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের মোড়লী মেনে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তারাপুরের জন্য ইউরেনিয়াম সরবরাহে অস্বীকৃতি এবং এই ব্যাপারে তাদের এড়িয়ে যাওয়া এবং দুমুখো নীতি তাদের প্রিয় চাপসৃষ্টির নীতি (ব্ল্যাক মেল) স্পষ্ট করে তোলে।

যাই হোক, তারা যে সর্বত্র ইচ্ছানুসারে চলতে পারছে তা নয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের পেছনে এদের সমর্থন এবং এদের চক্রান্তকে জনগণ প্রতিরোধ করছে। ইরানে এদের পুতুল শাহ্‌কে জনগণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আফগানিস্থানেও এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে এক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। অনুন্নত দেশের সর্বত্র অর্থনৈতিক জীবনকে তাদের কব্জা করার প্রচেষ্টা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।

কমরেডস, কাম্পুচিয়ায় যে সরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করে, তাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিন্ত করে, আমরা সেই নূতন বিপ্লবী সরকারের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাই।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

কমরেডস, বর্তমানে সামরিক একনায়কত্বের কবলে পিষ্ট, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমাদের দৃঢ় সংহতি ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা কর্তব্য। পাকিস্তানের বর্বর শাসকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়ে যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তাদের উপর প্রকাশ্য বেত্রদণ্ডের প্রবর্তন করেছে। অনেক শ্রমিক ধর্মঘট করার অপরাধে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। অনেক সাংবাদিককে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার সাহসের জন্য বেত্রদণ্ড সহ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইসলামের নামে সাধারণ অপরাধের জন্যও মধ্যযুগীয় শাস্তি ব্যবস্থা কায়েম করেছে। আমরা জানি পাকিস্তানের জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণী সাহসের সঙ্গে এই ব্যবস্থার মোকাবিলা করে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটর এই উপমহাদেশে আমেরিকার প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

আমরা জানি, বাংলাদেশে নির্বাচন ঘটলেও এই নির্বাচন নামক পরিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য একনায়কত্বের শাসনকে শক্তিশালী করা। বাংলাদেশের জনগণ যাঁরা ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচার সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বর্বরতা সাফল্যের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছেন, আমাদের সহানুভূতি তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। সাম্রাজা-

বাদীদের অংগুলি হেলনে মুজিবর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের হাতই দেশে একনায়কত্ব কায়েম করার পিছনে কাজ করছে।

একনায়কত্বের শক্তিসমূহ

১৯৭৫ ও ৭৭ সালের মধ্যে উপমহাদেশের তিনটি দেশেই কোন না কোন ধরনের একনায়কত্ব যে কায়েম হয়েছিল, তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; ভারতে জরুরী অবস্থার একনায়কত্ব উঠে গেলেও অপর দুটি দেশে সেই শাসনই কায়েম রয়েছে। এই দুই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই এখানে কোন খাঁটি সদীয় গণতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে একথা গভীরভাবে অনুধাবন করতে ও বুঝতে হবে যে এই তিন দেশেই একনায়কত্বের শাসন গড়ে ওঠার ও চলতে থাকার পিছনে গভীর অর্থনৈতিক শক্তিগুলির হাত রয়েছে। একথা বোঝার দরকার আছে যে এই দেশগুলির বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির পক্ষে দীর্ঘকাল পার্লিয়ামেন্টারি গণতন্ত্র মেনে চলা সম্ভব নয়, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সময় তো নয়ই। তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে জনগণের সংগ্রামকে দমন করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর এই আঘাত। গতিহীন অর্থনৈতিক অবস্থা ও পুঁজিবাদ ঘেঁষা সম্পর্কগুলি রক্ষিত হতে থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে সুবিধাগুলি দেওয়া যেতে পারে সেগুলি সীমিত হয়ে পড়ে, তাই শোষণের ফলে যে গণ-আন্দোলনগুলি ক্রমাগত গড়ে উঠতে থাকে তাকে টুঁটি চেপে রাখার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কাজেই এই দেশগুলিতে গণতন্ত্র রক্ষার শক্তিগুলির সংগে একনায়কত্বের পক্ষের শক্তিগুলির বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে; ভারতবর্ষে এই বিরোধই কিছুদিন ধরে চলছে।

গণতন্ত্রকে রক্ষা ও প্রসারিত করার কাজে গভীরভাবে আগ্রহী শক্তিগুলি সংখ্যালঘু একনায়কত্বের আগ্রহী শক্তিগুলির চেয়ে সংখ্যাধিক্যে বহুগুণে বলীয়ান। গণতন্ত্রের শক্তিগুলির মধ্যে যদি ঐক্যকে নিশ্চিত করা যায় তবে সেগুলি একনায়কত্বের শক্তিগুলির চেয়ে বিপুলভাবে বলীয়ান। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একনায়কত্বের শক্তিগুলি শক্তিহীন। অর্থনৈতিক শোষণ-পিষ্ট জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারিত করার প্রয়োজনে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। একনায়কত্বের সুযোগ একমাত্র তখনই আসে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যখন হয় খুব দুর্বল বা বিভক্ত থাকে। একনায়কত্বের শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সংগে সংগ্রাম, জনগণের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জরুরী অবস্থা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে

এ কনায়কত্ব সাধারণ মানুষের অধিকারকে পদদলিত করতে কতদূর যেতে পারে। আইনের শাসন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং যে কোন লোককে মিসায় গ্রেপ্তার করা যেত। হাজার হাজার মানুষকে জেলে পোরা হয়েছিল এবং অনেককে গোপনে অত্যাচার ও হত্যা করা হয়েছে। সরকার প্রকাশ্যেই দাবি করত যে নাগরিকদের স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার বঞ্চিত করার অধিকার তাদের আছে এবং এ বিষয়ে আদালতকে দিয়ে তাদের অধিকার যাচাই করে নেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করত না। শ্রমিকদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলির অধিকার কার্যতঃ লোপ করা হয়েছিল। সংগঠন গড়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং একনায়কত্বের প্রয়োজনে সংবিধানকে বে-আইনীভাবে সংশোধন করা হয়েছিল। সমস্ত দেশকে একটি দলের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল এবং আইনের পরোয়া না করে আমলাতন্ত্র যথেচ্ছা দেশকে শাসন করত।

জরুরী অবস্থার পুনরাবির্ভাব ও জনগণের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ঘটনা নিবারণ করতে শ্রমিকশ্রেণীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, তাঁদের স্মরণ রাখতে হবে যে জরুরী অবস্থায় প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ; মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাই, লক আউট, মজুরদের মজুরী, বোনাস, মহার্ঘভাতা কমানোর অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল ; এক কথায় শ্রমিকশ্রেণীকে পরিপূর্ণ দাসে পরিণত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। জরুরী অবস্থার অর্থই ছিল- গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ ও পুঁজিপতি মালিকদের কাছে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাসত্ব।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে কি করে এটা ঘটল যে শ্রমিকশ্রেণী জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে নিবারণ করতে পারল না, এবং এটাই বা কি করে ঘটল যে জরুরী অবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালানো গেল না? এর কারণ হল শ্রমিকশ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে আকণ্ঠ ডুবে ছিল, এর কারণ রাজনৈতিক বিভাগের জন্য তারা এক হতে পারল না, এর কারণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তিশালী অংশ অর্থনীতিবাদ আঁকড়ে বসে ছিল এবং শাসকশ্রেণীর সংগে যোগ দিয়ে জনগণকে পরিত্যাগ করেছিল। সব রংয়ের সংস্কারপন্থী ও শোধনবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশকে ভুল পথে চালিত করে একথা বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে জরুরী অবস্থা শুধু প্রতিক্রিয়াশীলদেরই বিরুদ্ধে, জনগণের বিরুদ্ধে নয়। এরা হচ্ছে তারাই যারা কংগ্রেস সরকারের সংগে সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের হীন একনায়কত্বের শাসনকে যুক্তিযুক্ত বলে ঘোষণা করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে শুধু ঐক্য গড়ে তুললেই হবে না

তাকে কোন শ্রেণী-সমন্বয়ের আদর্শের শিকার হতে অস্বীকার করতে হবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একনায়কত্ব এবং ফ্যাসিজম-এর মুখোমুখি হয়ে কোন্ দেশ বা জাতি সেই বিপদকে ঠেকাতে পারে একমাত্র যদি সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্যান্য শ্রেণীকে এই সংগ্রামে টেনে আনতে পারে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় যখন ইন্দিরা পরিচালিত শক্তিগুলি তাদের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে তখন শ্রমিকশ্রেণীকে বিগত দিনের ভুল থেকে এই শিক্ষা মনে রাখতে হবে এবং একনায়কত্বের দুরাকাংখার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভারতের অর্থনীতি

ভারতের অর্থনীতি একটানা গতিহীনতা ও সংকট দ্বারা আক্রান্ত, এর প্রধান শিকার হচ্ছেন কৃষক সাধারণ ও ক্ষেতমজুর, সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকেরা এবং কর্মচারীরা।

১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত প্রথম চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মিশ্রিত প্রকৃত আয় বেড়েছে শতকরা ৪·১১ ভাগ, পরের দশ বছরে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত তা কমে গিয়ে শতকরা ৩·৭৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৮ ৭৯ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় এই বছরে জি. এন. পি (সার্বিক জাতীয় উৎপাদন) বেড়েছে শতকরা ৩·৫ ভাগ যেখানে ১৯৭৭-৭৮এ ছিল শতকরা ৭·২ ভাগ। এই সমীক্ষা থেকে বাৎসরিক বৃদ্ধির নিম্নলিখিত অংকগুলি পাওয়া যায়।

বার্ষিক উন্নয়নের হার		১৯৭০-৭১ সালে মাথা পিছু মূল্যমান (জাতীয় নহে)	
১৯৭২-৭৩	১·১	১৯৭২-৭৩	৩·৬
১৯৭৩-৭৪	৫·০	১৯৭৩-৭৪	২·৯
১৯৭৪-৭৫	০·৮	১৯৭৪-৭৫	১·০
১৯৭৫-৭৬	৮·৯	১৯৭৫-৭৬	৬·৮
১৯৭৬-৭৭	১·২	১৯৭৬-৭৭	০·৬
১৯৭৭-৭৮	৭·২	১৯৭৭-৭৮	৫·২

এই অনুন্নত দেশ যেখানে দারিদ্র্য ও বেকারী দূরীকরণের জন্য উন্নয়নের হার প্রচুর হওয়া দরকার সেখানে এরই মধ্যে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৭৪-৭৫-এর গ্রামীণ শ্রমিকদের সমীক্ষায় গ্রামীণ শ্রমিকদের এক করুণ চিত্র ধরা পড়ে। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, কিছু জমি আছে এমন কৃষি মজুরের সংখ্যা শতকরা ৯·৫৭ থেকে

১২·৪৩ ভাগ বেড়েছে, অর্থাৎ ৬৭·৩৩ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২ লক্ষে পৌঁছেছে। এটা ঘটেছে কংগ্রেসের ভূমি সংস্কার আইনে চাষীর হাতে জমি দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়েছে তারই ফলে; এর থেকে দেখা যায় যে ছোট কৃষকেরা হয় ধীরে ধীরে ভূমিহীন হয়ে পড়ছে অথবা তাদের জমি থেকে জীবিকা অর্জন করতে না পেরে অন্যের জমিতে মজুর খাটতে বাধ্য হচ্ছে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ছোট কৃষককে রক্ষা করবার সবরকম ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাজারের অর্থ-নীতি, দাম নির্ণয়ের ব্যবস্থা, আদায়কারী কর্তৃপক্ষ, জমিদার ও সুদখোর মহাজন তাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে, এর ফলে সে তার উৎপাদনের বৃহদংশ এই সব শক্তিগুলির কাছে সমর্পণ করে নিম্নতম মজুরীতে শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হচ্ছে। ভূমিহীন গৃহস্থ চাষীর অনুপাত ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭৪ ৭৫ সালে শতকরা ১২·২২ থেকে ১২·৮৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাজ পাওয়ার ব্যাপারে এই অসংখ্য শ্রমিকের অবস্থা কি? গৃহস্থ চাষীর মজুরীর বিনিময়ে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ বৎসরে কত পূর্ণ দিন তারা পায়? ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে ২০৮ পূর্ণ দিন কাজ পেত, ১৯৭৪-৭৫ সালে কমে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছে ১৮৫ পূর্ণ দিন। নারীদের বেলায় সংখ্যা ১৩৮ থেকে কমে ১২৯-এ দাঁড়িয়েছে এবং ১৫ বছরের কম বয়সীদের ১৬৭ থেকে কমে ১৪৫ হয়েছে। এইভাবে, সব কৃষি মজুরের বেলায়ই বৎসরের বেশির ভাগ সময়ে বেকার থাকতে হচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ দিক হল, যখন সরকার এবং জমির মালিকরা সবুজ বিপ্লবের ঐন্দ্রজালিক গুণের বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখন বেকারী বাড়ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে। যখন মাত্রাধিক ফলনের ফসল কাটা হয়ে সরকারের গুদামগুলি উপচে পড়ছে, তখন কৃষি মজুর দর হাতে কাজও নেই এবং যে ফসল তারা উৎপাদন করেছে তা কেনার ক্ষমতাও নেই। এই আংশিক কর্মে নিযুক্ত কৃষি মজুরদের মজুরীটা কত? পরিকল্পনা কমিশনের প্রকাশিত এক দলিল অনুসারে কৃষি মজুরদের মজুরী টাকার মূল্যে ১৯৬১-৬২র দৈনিক ১·৭৬ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৬ ৭৭ সালে ৪·৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে—হয়ত কংগ্রেসের হিসেব মত এটা একটা সাংঘাতিক বৃদ্ধি। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সালের প্রকৃত মজুরী ১৯৬১ ৬২ সালের চেয়ে অনেক কম, অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সালে দৈনিক ১·৭৬ টাকা তৎকালীন মূল্য-মানে অনেক বেশি। নীচের অংকগুলি থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে:

সাল	মজুরী (টাকায়)	প্রকৃত মজুরী
১৯৬১-৬২	১·৭৬	১·৬৬
১৯৬৬ ৬৭	২·৬৩	১·৩৮
১৯৭১-৭২	৩·১০	১·৫৫
১৯৭৬-৭৭	৪·৯৫	১·৬৪

এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, ১৯৭৬-৭৭ সালে যখন ২০ দফা কর্মসূচী পুরোদমে চলছিল, যে কর্মসূচী কৃষি মজুর ও গরীব কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা হবে বলে দাবী করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দেখা গেল কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী ১৫ বছর আগের মজুরীর চেয়েও কমে গেল। পরিকল্পনা কমিশনের একই দলিলে মন্তব্য করা হয়েছে "একথা উল্লেখ করা দরকার যে, দশ বছরে (৬৪-৬৫ থেকে ৭৪ ৭৫) কৃষিতে নিযুক্ত মজুরদের দৈনিক গড় আয় ১·৪৩ টাকা থেকে ১·৮২ টাকা এবং কৃষি বহির্ভূত কাজে ৩·২৪ পয়সা থেক ৪·০৯ টাকা বেড়েছিল, একই সময় কৃষি মজুরদের ভোগ্যপণ্যের মূল্য-সূচক (১৯৬০-৬১=১০০) ১৯৬৪-৬৫তে ১৪৩ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ ৭৫ সালে দাঁড়িয়েছিল ৩৬৮। কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরীর অবনমন হয়েছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ১২ ভাগ, নারী শ্রমিকদের শতকরা ৭ ভাগ এবং অপরিণত-বয়স্ক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কাজে এই অবনমন আরও বেশি, আনুপাতিকভাবে তাদের ক্ষেত্রে অবনমন ঘটেছে যথাক্রমে শতকরা ১৫, ২৩ ও ১২ ভাগ।

এর অর্থ গত দশ বছরে গ্রামীণ শ্রমিকগণ (কৃষি ও অকৃষি শ্রমিকদের নিয়ে) এক দানবীয় মজুরী সংকোচনের সম্মুখীন হয়েছিলেন যার ফলে তারা নিঃস্ব হওয়ার দিকে চলে গিয়েছিলেন; এবং এরই সঙ্গে চলেছিল কর্মে নিয়োগের সুযোগের সংকোচন। এই ভাবেই ভূমি সম্পর্কের সংকট গ্রামীণ মানুষকে প্রভাবিত করে তাদের মরীয়া করে তুলেছে। হরিজনদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীগুলি এই ভীষণ মজুরী সংকোচন ও তাদের উপর যে নিঃস্বতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার সংগে সম্পর্কহীন নয়। হরিজনেরা বেশির ভাগই ভূমিহীন এবং তাদেরই ভূমি সম্পর্কের সংকট ও জাত-ভিত্তিক অত্যাচারের বোঝা বইতে হয়। কাজেই এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে তাদের প্রতিরোধ কর্তৃপক্ষের সাহায্যপুষ্ট জমিদারদের অমানুষিক আক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা গত বৎসর যখন আফশোস করে ঘোষণা করে যে "গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও গ্রামের বস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি," তখন আশ্চর্য হবার কি থাকে? এই বছরগুলিতে অথবা ১৯৭৬ ৭৭ সালে যাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তারা দরিদ্র কৃষক বা কৃষি শ্রমিক নয়। সবুজ বিপ্লব ও কৃষিপণ্যের অধিক উৎপাদন স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের বাজারকে প্রসারিত করবে, বুর্জোয়া ও জমিদারদের এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কারণ কৃষিপণ্যের অধিক উৎপাদনের উপকার ভোগ করেছে ধনী কৃষক ও জমির মালিক।

অসাম্যের বৃদ্ধি

বাস্তবপক্ষে, সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে আয়ের অসমতা বেড়েই চলেছে। ১৯৭৮-৮৩-র খসড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রিজার্ভ ব্যাংকের অনুসন্ধানের ফল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে ঃ

"রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্যানুসারে দেখা যায় কেন্দ্রীভূত সম্পদের অনুপাত বিশেষ করে গ্রামীণ গৃহস্থদের হাতে কৃষিযোগ্য ভূমির অনুপাত, ৬১-৬২ সালে ছিল ০·৬৫ এবং ১৯৭১-৭২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০·৬৬; দরিদ্রতম গ্রামের গৃহস্থদের হাতে রয়েছে শতকরা মাত্র ০·১ ভাগ এবং শতকরা ১০ ভাগ ধনীদের হাতে রয়েছে প্রকৃত সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি এবং এটা ১৯৭১-৭২ সালে যা আছে ১৯৬১-৬২ সালেও তাই ছিল। এই তথ্য থেকে দেখা যায় যে ষাটের দশক পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থাগুলি গ্রামীণ সম্পদ বিভাজনের উপর কোন দৃশ্যমান প্রভাব রাখতে পারেনি।" কিন্তু ১৯৭১-৭২-এর পরের মুদ্রাস্ফীতির ফলে গ্রামীণ জনগণের দুরবস্থা আরও প্রকট হয়েছে এবং সম্পদ ও ক্রয় ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক ও অকৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত কমে গিয়েছে এবং তার থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গ্রামীণ সম্পদের অসমবণ্টন কোন্ মর্মান্তিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। কাজেই শহরের শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের কি কোন সুযোগ আছে? এই ভূমি সম্পর্ক এবং কৃষকদের শোষণ শিল্পের অগ্রগতিকে খর্ব করে রাখছে এবং তার ফলেই কারখানায় শিল্প-শ্রমিকদের নিয়োগও খর্ব করে দিচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণী বুঝতে পারেন না যে, যদি তারা গ্রামীণ জীবনের অসমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেন তবে তাদের জীবন-যাত্রার মানের উপর আক্রমণ প্রতিরোধের সংগ্রাম নিষ্ফল হবে।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্ক এরই মধ্যে ভারতের শিল্পের অগ্রগতিকে মন্থর করেছে। গ্রামীণ বাজারের সম্প্রসারণ যদি সংকুচিত হয় তবে ভারতের শিল্পগুলির পক্ষে পূর্ণ বিকাশের ক্ষমতা ব্যাহত হবে এবং ঠিক তাই ঘটছে। গ্রামীণ জীবনে সুপ্রসারিত বাজার না গড়ে ওঠার ফলে শিল্পগুলিকে সংখ্যা-লঘুদের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হচ্ছে। আবার খসড়া পরিকল্পনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। "যে রূপরেখা ধরে শিল্পোন্নতি ঘটছে তা অনিবার্য-ভাবেই কার্যকরী চাহিদার গঠনে প্রতিফলিত, এবং সেটা আবার আয়ের বিতরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। উৎপাদনে যে উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার এক বৃহৎ অংশ অবাঞ্ছিতভাবে উচ্চ আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনের মানকে প্রত্যক্ষ

ও অপ্রত্যক্ষভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যয়িত হয়। এর অর্থ শিল্পের প্রসার বাজারের সংকোচন দ্বারা সীমিত। এর ফলে ভোগ্য পণ্য বা তাদের উৎপাদনকারী দ্রব্যাদির বিকল্প গড়ে তোলা, বর্তমান চাহিদার অবস্থায়, ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রেরণা যোগাতে পারে না।"

মজুরীর উপর আক্রমণ

শিল্পোন্নয়নের নিশ্চল অবস্থা বর্তমানে এক পুরাতন ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন করতে গেলে যে অর্থনৈতিক সংকট অপরিহার্যভাবে দেখা দেয়, তার এক অনিবার্য অংশ হয়ে পড়েছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার ছোট শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে, শতাধিক সুতাকলে সরকারের অধিগ্রহণ ঘটেছে এবং বস্ত্র ও পাটের মত বৃহৎ শিল্পে ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ হতে দেখা গেছে। সংকটের এই কয়েক বছরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ ঘটেছে এবং সে আক্রমণ শ্রমিকশ্রেণী বীরত্বের সংগে প্রতিরোধ করলেও বার বার এই আক্রমণ চলেছে কখনও সোজাসুজি অত্যাচারের মাধ্যমে কখনও শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী আইনের সাহায্যে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিঃসন্দেহে মালিক ও সরকারকে বোনাসের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছে এবং ধর্মঘটের চাপে মহার্ঘভাতা ও বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু সরকার ও মালিকশ্রেণী এই সমস্ত অর্জিত সুবিধাগুলি, জীবনধারণের খরচের হিসাবে কারচুপি ঘটিয়ে এবং অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি চাপিয়ে দিয়ে অর্থহীন করে তুলেছে। এর ফল এই হয়েছে যে সাধারণভাবে টাকার অংকে মজুরী বাড়লেও প্রকৃত মজুরীর কোন ইতরবিশেষ বৃদ্ধি হয়নি। খুব বেশি হলে এইটুকুই বলা চলে যে শ্রমিকশ্রেণী তার জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ করেছে বটে কিন্তু তাকে সংকটের বোঝা বইতেই হয়েছে। জরুরী অবস্থা বোনাস ও মহার্ঘভাতার উপর কারচুপি করে, বাধ্যতামূলক আমানতকে দীর্ঘায়িত করে এবং ধর্মঘটকে বেআইনী করে, স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেবার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর মজুরীর অবস্থা নীচের বক্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট করে বোঝা যাবে:

পরিকল্পনা কমিশনের যে দলিলের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেই অনুসারে ১৯৬১-৭৬ সালের মধ্যে শ্রমিকদের 'বার্ষিক গড় মজুরী' নিম্নোক্তভাবে ওঠা-নামা করেছে।

সাল	বর্তমান মূল্যমানে মজুরীর আয় (টাকায়)	১৯৬০-৬১র দামে মজুরীর আয় ভোগ্য পণ্যের দামের সূচক (—১০০) (টাকায়)
১৯৬১	১৪১৩	১৩৫৯
১৯৬৬	২০৪৫	১৩৫৪
১৯৭১	২৭৬১	১৪৩৮
১৯৭৬	৪৩৭৪	১৪৫৩

দলিলে মন্তব্য করা হয়েছে "শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্য পণ্যের সূচক সংখ্যা ধরলে ১৯৬১ থেকে মাত্র শতকরা ৭ভাগ বেড়েছে।" এই সামান্য বৃদ্ধিও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমদপ্তরের জালিয়াতিপূর্ণ জীবন যাপনের খরচের সূচক নির্ধারণের ভিত্তিতে ঘটেছে এবং সি আই টি ইউ বারবার এর মুখোশ খুলে দিয়েছে। কমরেড পান্ধে, যিনি সূচক কমিটির সভ্য ছিলেন, তিনি শ্রমিকদের উপর জালিয়াতির সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। দলিলে আরও বলা হয়েছে "প্রকৃত বার্ষিক মজুরী তৃতীয় পরিকল্পনায় সামান্য শতকরা ০·৫ ভাগ বেড়েছিল, তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় শতকরা ২ ভাগ কমেছিল, চতুর্থ পরিকল্পনায় ১% বেড়েছিল এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে যে তিন বছর শেষ হয়েছে তাতে গড়ে ২·৬৬% বেড়েছিল"। এই সামান্য বৃদ্ধি আদায় করতে শ্রমিকশ্রেণীকে অনেক তিক্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে, জরুরী অবস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দীর্ঘ অনাহার, লক-আউট এবং পুলিশের গুলি বর্ষণের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে, যার ফলে অসংখ্য অমূল্য জীবন বিনষ্ট হয়েছে। এসব সত্ত্বেও পুঁজিপতিদের অনেক ভাড়াটে শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ দাবী করছে বলে শ্রমিকদের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

যাদের মাসিক আয় ৪০০ টাকার কম, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

বৎসর	মাথা পিছু আয় (টাকার অংকে)	প্রকৃত আয়ের সূচক সংখ্যা (১৯৬১=১০০)
১৯৬১	১৫৪০	১০০
১৯৬৬	২১১২	৯৫
১৯৭১	২৮৫২	১০১
১৯৭৫	৩১৭১	৬৬

১৯৭৫ সালের সাংঘাতিক অবনমন সম্বন্ধে দলিলে বলা হয়েছে যে এই জাতীয়

শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৭২ সালের ৩১ লক্ষ ৬১ হাজার থেকে ১৯৭৫ সালে কমে ২ লক্ষ ১৭ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সংখ্যা কমে যাওয়ার আপাত কারণ হচ্ছে সেইসব শ্রমিককে বাদ দেওয়া হয়েছে যারা ৪০০ টাকার বেশি পেতে শুরু করছে। সব মিলিয়ে এটা পরিষ্কার, যেমন আগের গতি-প্রকৃতি থেকেও দেখা গেছে যে, যারা ৪০০ টাকার নীচে আয় করে তাদের প্রকৃত মজুরী কোনদিনই তেমন বাড়েনি। দলিলে মন্তব্য করা হয়েছে "শিল্পের বার্ষিক তথ্য সমীক্ষা এবং পেমেন্ট অব্ ওয়েজ এ্যাক্টের তথ্য উভয় থেকেই বোঝা যায় ১৯৭১ সাল থেকে টাকার অংকে মজুরী বৃদ্ধি পেলেও শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরীর ঘাটতিই ঘটছে, বিশেষ করে ১৯৭৩ সাল থেকে' ৭৫ সালে শিল্প শ্রমিকের পণ্যমূল্য সূচক সংখ্যা যখন ১৯৭৩ সালের ২০৬ থেকে ১৯৭৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২১-এ পৌঁছায়।" স্বাভাবিকভাবেই আংশিক হলেও এ ঘটনা সেই জরুরী অবস্থারই অবদান যেটা আবার ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির পর পরেই ঘটেছিল। শ্রীযুক্তা গান্ধী জরুরী অবস্থার লাভ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। শ্রমদপ্তরের হিসাব জরুরী অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী কি লাভ করেছিল তাই দেখিয়ে দেয়।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য

১৯৭৮-৮৩ সালের পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে "ভারতে দারিদ্র্যের ব্যাপকতা পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই বিচারের মান অনুসারে দেখা যাবে শতকরা ৪০-৬০ ভাগ জনসংখ্যাই জীবনধারণের নিম্নতম গ্রাহ্য মানের অনেক নীচে। গৃহীত ক্যালোরির মান ধরলে দেখা যাবে ১৯৭৭-৭৮ সালে দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যার হিসাব দাঁড়াবে গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৮ এবং শহরাঞ্চলে শতকরা ৪১ এই মানে বর্ণনা করলে দরিদ্রের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৯কোটি, এর মধ্যে আবার ১৬ কোটি দারিদ্র্য সীমার শতকরা ৭৫ ভাগের অনেক নীচে।"

এই কয়েক বছরে ধন ও সম্পদের এক অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘুর হাতে যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি বলে পরিচিত। ভারতের ২০টি বৃহৎ পরিবারের (যে সব পরিবারের হাতে ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে) সম্পদ ১৯৭২-৭৩ সালের ৩৫৭৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৫-৭৬এ দাঁড়িয়েছিল ৪৯৬৬ কোটিতে (বৃদ্ধির হার ৪১·২%)। তাদের প্রকৃত সম্পদ ১৯৭২-৭৩এর ১৪৩১ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২০১২ কোটিতে অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৪০·৬%। বড় জমিদার, ফাটকাবাজ ও বিদেশী পুঁজিপতিরা হলেন অন্যান্য অংশীদার যাদের লুণ্ঠন ভারতের জনসংখ্যার

শতকরা ৬০ ভাগকে দারিদ্র্য সীমার নীচে ঠেলে দিয়েছে। জরুরী অবস্থায় এই লুণ্ঠন অব্যাহতভাবে চলেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে অর্থনৈতিক সংকট যখন গ্রামীণ জনগণকে ক্রয়মূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে, যখন জমিদার, পুঁজিপতি ও বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি অবাধ লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে তখন সম্পত্তির মালিকানার সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত না করে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাপনের অবস্থা পরিবর্তনের অন্য কি উপায় আছে? শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে যে, জমিদারদের জমির উপর একচেটিয়া অধিকার ও কৃষকের হাতে জমি বন্টনের জন্য কঠিন সংগ্রাম ছাড়া শিল্পের উন্নয়ন বা শিল্পে কর্মসংস্থানের অন্য কোন উপায় নেই। বিদেশী পুঁজির শোষণ সম্পূর্ণ নির্মূল না করে এবং ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংস্থাগুলি জাতীয়করণ না করে আমাদের পক্ষে শিল্পে বেকারীর এবং ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। এরই সংগে জনগণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরই একমাত্র সমাজতন্ত্র ও সমস্ত শোষণ মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে।

বেকারী

কমরেডস্, একইসঙ্গে শহরে ও গ্রামে বেকারীর সমস্যা আজ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২১ লক্ষ—দশ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ। বেকারি বৃদ্ধির এই দ্রুতগতি যা কমবার কোন চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না, এ সবই শাসকশ্রেণী কর্তৃক পুঁজিবাদী পথে উন্নয়নের নীতি গ্রহণের অনিবার্য ফল।

ধীরে ধীরে শিল্প গঠনের পুঁজিবাদী পথই কর্মসংস্থানের শ্লথগতি সৃষ্টি করে। ভারত সরকারের কর্মসংস্থান বিভাগের অধিকর্তা কর্তৃক পরিবেশিত হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৭১-৭৭ সালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার থেকে বেড়ে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৮৬ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২·৭ শতাংশ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অবস্থা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। বৃহৎ বেসরকারী নিয়োগ সংস্থাতে ১৯৭১ সালে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ১৮ হাজার, ১৯৭৭-এ সেখানে মাত্র ৬২ লক্ষ ২১ হাজার।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি, যার সম্বন্ধে প্রাক্তন ও বর্তমান সরকার সমান বাগাড়ম্বর করেছেন, সেখানেও একই কাহিনী প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে কর্ম-

সংস্থানের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ১৬ হাজার, ১৯৭৬ সালে সেখানে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ২১ হাজার মাত্র।

১৯৭১ ও '৭৭ সালের মধ্যে সরকারী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সংখ্যা ৩৭ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই বৃদ্ধির এক বৃহৎ অংশ অর্থাৎ ১১ লক্ষ-ই হল সামাজিক-সম্প্রদায়গত, জনসংযোগ ক্ষেত্রে। এগুলির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রের এবং রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মীরা, যাদের কাজ হল শাসকশ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা; তুলনামূলকভাবে সরকারের উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ।

কিন্তু কম সংস্থান বৃদ্ধির এই শ্লথ গতিই গ্রামাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে ভয়াবহ বেকারী বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করলে শিল্পে উন্নয়নের শ্লথ গতি যত লোকের কর্মসংস্থান ঘটায় তারচেয়ে বেশি মানুষকে কর্মচ্যুত করে এবং উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্নকরণের গতি তরান্বিত করে, ফলে বহু লোক তাদের বৃত্তি ও জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৭৮-৮৩র খসড়া পরিকল্পনা মন্তব্য করেছে "গ্রামীণ শ্রমশক্তির পূর্ণ নিয়োগের অভাবের জন্য শুধু চাষের কাজে মরশুমী নিয়োগই দায়ী নয়, এর জন্য বৃহৎ শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় কারিগর ও হস্ত শিল্পীদের বৃত্তি চ্যুতিও দায়ী। অনুরূপভাবে শহরাঞ্চলের বেকারী শুধুমাত্র ক্ষয়িষ্ণু শিল্পের ছাঁটাই শ্রমিকদের অথবা নূতন কর্মপ্রার্থী শ্রমিক এবং আশে-পাশে থেকে আসা শ্রমিকরাই নয়। এই বেকারদের মধ্যে আছে বিরাট সংখ্যক স্বনির্ভর মানুষ ও সাময়িক কর্মরত শ্রমিকরা, যারা চরম দুরবস্থায় জীবনযাপন করে।

কর্মসংস্থান সম্পর্কে শিল্প ও বর্তমান অর্থনীতির সার্বিক অক্ষমতার কথা পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত কথায় প্রকাশ করা হয়েছে:

"১৯৭১ ও '৭৮ সালের মধ্যে যখন শ্রমিক হওয়ার উপযুক্ত জনসংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ বৃদ্ধি পেল তখন মাত্র ৯০ লক্ষ অকৃষি কর্মক্ষেত্রে যে কাজ পেল তার অর্ধেক সংগঠিত ক্ষেত্রে অন্য অর্ধেক অসংগঠিত ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে শ্রম-শক্তিকে নিয়োগ করবার যে ছকটি রয়েছে তা হল, মাত্র শতকরা ১০ থেকে ১১ ভাগ বর্ধিত শ্রমশক্তি সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়, অন্যান্যেরা গ্রামে স্বল্পকালীন কাজ খুঁজে নেয় অথবা শহরাঞ্চলের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে অথবা প্রায় স্থায়ীভাবেই বেকার থেকে যায়"। এই হিসাব অনুসারে বিগত আট বছরে অন্ততঃ ২ কোটি লোক আংশিক বা পূর্ণ বেকারের তালিকায় যোগ হয়েছে।

এই হল জনতা নীতি দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় অর্থনীতির বীভৎস রূপ;

১০০ জনের মধ্যে ১৩ জন কর্মপ্রার্থী মাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ হতে পারে এবং এই নিয়োগক্ষেত্রের মধ্যে কারখানা ছাড়া ব্যাংক, জীবনবীমা, বাণিজ্যিক সংস্থা এবং সরকারী চাকুরীকেও ধরা হয়েছে ; বাকি শতকরা ৮৭ ভাগ ঘুরে বেড়ায় এবং হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে।

যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তবে শ্রমিকশ্রেণীর শিশুদের ভবিষ্যৎ মর্মান্তিক। এই অবস্থায় এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিত-ভাবে দেশের প্রকৃত নিয়োগের চিত্রটিকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যত কম করেই দেখানো হোক না কেন, সমস্যার গুরুত্ব চেপে রাখা যায় না। ভগবতী কমিটি ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ বলে নির্ধারিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে শহরাঞ্চলে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১ কোটি ২১ লক্ষে পৌঁছেছে। অন্যান্যদের হিসাবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৯০ লক্ষের মত ; বিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ ডাঃ অমর্ত্য সেন এই সংখ্যা ৪ কোটি ২৪ লক্ষ বলে হিসাব করেছেন। আজকের বাস্তব অবস্থা এই সংখ্যারই কাছাকাছি।

একজন নূতন কর্মপ্রার্থীর পক্ষে এই অবস্থায় শহরাঞ্চলেই হোক আর গ্রামাঞ্চলেই হোক, কাজ পাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা থাকে? এদের বৃহত্তর অংশের নিঃস্বতার সীমারেখায় পৌঁছানোই নিয়তি। যখন দেখা যায় অপরাধ ও সমাজবিরোধীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, শহরগুলি গুণ্ডার দলে ভরে গেছে, বস্তি-বাসী শ্রমিক শিশুরা বে-আইনী চোলাই বা মাদকদ্রব্য সরবরাহ ও অন্যান্য বে-আইনী কাজ করছে তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে কি?

আমাদের জনগণের আরও উন্নতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি, মজুরী বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের অবস্থার উন্নতি, এই সব সাধন করা দুঃসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায় যদি না শ্রমিকশ্রেণী এই সমস্ত সমস্যাকে গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করে এবং সমাধানের জন্য সংগ্রাম না করে। প্রত্যেক শ্রমিকের এই সত্য মনে রাখা দরকার যে তাদের সন্তানদের ও যুবক আত্মীয়দের একশতের মধ্যে মাত্র ১৩ জন সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ পেতে পারে, ৪ থেকে ৫ জন মাত্র কারখানায় কাজ পেতে পারে।

এই জন্যই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ দাবী ওঠা দরকার যে কাজ পাওয়ার অধিকারকে সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করতে হবে। সরকারকে সমস্ত লোককে কাজ দেওয়ার সাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের অবিলম্বে রিলিফ দিতে হবে। জনতা সরকারের ৪৫তম সংবিধান সংশোধন

বিলের একটি ধারা থাকা উচিত ছিল যাতে কাজ করবার অধিকার মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। সরকারের এ কাজ করার অক্ষমতা তাদের শ্রেণীগত সীমা ও দৃষ্টিকোণকেই প্রতিফলিত করে। কাজের অধিকারকে বাধা দেওয়ার কারণ যে তা হলে নিশ্চিতভাবে অধিকতর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক মালিকানার প্রশ্ন ওঠে যা জমিদার, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের শক্তিকে খর্ব করবে।

আমাদের অবিলম্বে স্থানীয় অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে বেকারদের কাজ দেওয়া বা সাহায্য দেওয়ার বাস্তব দাবি তুলতে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপালিটি, পৌর সংস্থা এবং পঞ্চায়েৎ কমিটিগুলিকে এই সাহায্যদানের কাজে সংগঠিত করতে হবে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটি দুর্বলতা এই যে তারা বেকারীর প্রশ্নকে তাদের সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গ্রহণ করতে পারে নি। আমাদের শ্রেণীর এক অংশের প্রতি ও যুব সমাজের প্রতি ঔদসীন্য ইতিমধ্যে উন্নততর জীবিকার মিলিত সংগ্রামকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

নূতন বিপদ

এরই মধ্যে এক নূতন বিপদের সূচনা হয়েছে। পুঁজিবাদী কায়েমীস্বার্থ এবং তাদের দালালরা কর্মে নিযুক্ত ও বেকারদের একজনকে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার প্রচেষ্টায় এক নূতন ধ্বনি তুলছে—বর্ধিত মজুরী নয়, প্রয়োজন হল বেশি লোকের কাজ পাওয়া।

কর্মরত শ্রমিকের উচ্চতর মজুরীর দাবির বিরুদ্ধে বেশি কাজ সৃষ্টির ধোঁয়ার অন্তরালে বেকারদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে ক্রমবর্ধমান বেকারীর কারণ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার সংগে জড়িত শ্লথ শিল্পোন্নতি এবং প্রাক-পুঁজিবাদী ভূমি সম্পর্ক। যে মূল কারণগুলি জনগণের জীবনে বেকারী সৃষ্টি করে সেগুলিই আবার কর্মরতদের নীচু মজুরীর জন্য দায়ী। এই একই বন্ধনের উপরে যদি বাস্তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্তৃক জোর না দেওয়া হয় তবে বেকারদের এই সব জিগির তুলে বিভ্রান্ত করার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

লক্ষ্য করা গেছে যে ধর্মঘটীদের উপর হিংসাত্মক আচরণ বেকারদের নামেই শুরু হয়েছিল। এর সংগঠক ছিল শিল্পপতিরা ও তাদের সংস্থাগুলি। গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংক কর্মচারীদের প্রতিবাদকালে আমেদাবাদে কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করার জন্য মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল।

এই মিছিলের অংশগ্রহণকারীরা বেকারদের স্বপক্ষে ধ্বনি তোলার ভান করেছিল। এই সতর্ক চিহ্ন সম্বন্ধে অবহিত থাকার প্রয়োজন আছে।

এটা গুজরাটের জনতা সরকারের একটা কলংক যে তারা ভয় দেখানো চলতে দিয়েছিল এবং অপরাধীদের শাস্তির কোন ব্যবস্থাই নেয় নি।

কমরেডস্, যখন শ্রমিকশ্রেণী ও তার ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গ্রামাঞ্চল ও শহরের বেকারদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন একই মোর্চায় সংগঠিত হয়ে এখনও চলতে শুরু করেনি, ইতিমধ্যেই শাসকশ্রেণী, সরকার এবং পুঁজিবাদীশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করে শ্রমিককে শ্রমিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদের একতাকে ক্ষুণ্ণ করতে শুরু করেছে। কাজ করার অধিকারের দাবী, যে দাবী সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত জাতের ও বিশ্বাসের শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার অধিকার দেয়, সেই দাবী মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তাদের দাওয়াই হল অঞ্চলের ভিত্তিতে, জাতের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নামে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে সুবিধা দেওয়ার নামে এবং দরিদ্রতর শ্রেণীকে সুবিধা দেওয়ার নামে শ্রমিকদের ভাগ করে দেওয়া। এর উদ্দেশ্য হল, সংকুচিত কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারই এদের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে স্বীকার করা। জনতা সরকার এখনও পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ঘৃণিত নীতিগুলি ত্যাগ করতে পারেন নি।

আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার আবেগগুলিকে উদ্দীপিত করে শাসকশ্রেণী এইটেই বোঝাতে চান যে এক রাজ্য যদি অন্য রাজ্যের শ্রমিকদের সে রাজ্যে এসে কাজ দাবী করার সুযোগ নিবারণ করতে পারে তবেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এবং এরাই হচ্ছে সেই লোকেরা যারা জাতীয় ঐক্যের নামে উচ্চ-কণ্ঠ, যারা ভারতবর্ষ এক এবং ভারতমাতার নামে গলা ফাটায়, এমনকি দেশ যখন এক তখন সকল দেশের উপর একই ভাষা চাপিয়ে দেবার দাবীতে সোচ্চার।

পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকারই একমাত্র সরকার যারা ঠিক ভারতীয় ও সঠিক শ্রেণী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের তালিকাভুক্তির হিসাবক্রমে কাজ দেওয়া হবে। অন্য সমস্ত রাজ্যে তালিকাভুক্তির ক্রম অনুসারে কাজ দেওয়াকে বিরোধিতা করা হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে এক দল কেরালার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উগ্র প্রাদেশিকতার আওয়াজ তোলে, বোম্বাইয়ে শিবসেনা একই ধুঁয়া তুলে তামিলনাড়ু ও কেরালার থেকে আগত শ্রমিকদের চাকুরি দেওয়ার বিরোধিতা করে। অন্ধ্র রাজ্যে মুলুকি উত্তেজনা সৃষ্টি করে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে আঞ্চলিকতার বিষ-

চিন্তা প্রবেশ করিয়ে, এক শ্রেণীকে অন্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে তাদের মনোযোগ একই সংগ্রাম থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। অনেক রাজ্যেই রাজ্য সরকারগুলি নানা হীন উপায়ে নিয়োগকর্তার উপর অন্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকদের পরিবর্তে স্থানীয় লোকদের কাজ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

বিনিয়োগ কেন্দ্রের পরিচালন ব্যবস্থা রাজ্যের হাতে হস্তান্তরের পর থেকেই রাজ্য সরকারগুলি 'বহিরাগতদের' কাজ দেওয়ার ব্যাপারে নানা বিধি আরোপ করেছেন যাতে স্থানীয় লোকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায়। আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, রাজস্থান, বিহার, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ দেওয়ার উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন—আপাত কারণ হয়ত বহিরাগতদের বঞ্চিত করা। এই সমস্ত বিধিনিষেধের কতকগুলি আবার সংবিধান-বিরোধী বলে গণ্য।

এটাও লক্ষণীয় যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও এমন সমস্যার সৃষ্টি করেন যাতে আঞ্চলিকতার আবেগগুলি ফেটে পড়ে। মাঝে মাঝেই দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগকর্তাগণ আঞ্চলিক ও মেধাসম্পন্ন মানুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করেন। আসামের বনগাইগাঁও রিফাইনারী এবং পেট্রোকেমিকেল লিমিটেডের ক্ষেত্রে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হওয়ার কারণ আছে।

অভিযোগ উঠেছে যে কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল যে ৫০০ টাকার অনধিক মাইনের সব কাজের জন্য আসাম থেকে লোক নেওয়া হবে কিন্তু দিল্লী বিনিয়োগকেন্দ্রে তালিকাভুক্তদের কাজ দেওয়া হয়েছে। বনগাইগাঁও রিফাইনারী ও পেট্রোকেমিকেল সংস্থায় দিল্লী থেকে লোক ভর্তি করার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে কর্মপ্রার্থীদের কাজ দেওয়ার দাবী জানান হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অর্বাচীন বৈষম্যমূলক আচরণ স্থানীয় উগ্র আঞ্চলিকতাবাদীদের হাতে এক অস্ত্র তুলে দেয়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এই সমস্ত বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে, স্থানীয় দাবী এবং দেশের সার্বিক অবস্থার প্রতি সমদৃষ্টি রেখে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে ঐক্যকে অটুট রাখতে হবে। কর্মে নিযুক্ত ও কর্মপ্রার্থীদের যতই তারা কাজ পাওয়ার অধিকারের দাবীর সঠিকতা বোঝাতে পারবেন ততই তারা ঐক্যসাধনে সক্ষম হবেন।

শুধু আঞ্চলিক বিরোধই যে বেকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যাহত করে তা নয়, জাতিভেদের প্রশ্নও বিরোধ সৃষ্টি করে। হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতি-ভেদ প্রথা অনুসারে কতকগুলিকে উচ্চ জাতি ও কতকগুলিকে নীচু জাতি বলে বিবেচিত হয়, এবং সেই প্রথা আজও অব্যাহত আছে। এই সব বিভিন্ন জাতের মধ্যে আদিবাসী ও হরিজন জনগণ হচ্ছে সেই অংশ যারা সবচেয়ে দুর্ব্যবহার পেয়ে এসেছে এবং যাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। এরা ছাড়াও একটা অংশ আছে যাদের অনগ্রসর বলা হয়ে থাকে। কাজ পাওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সম্বন্ধেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। এই বিভিন্ন জাতিগুলি আবার তাদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মর্যাদা প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত। বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে অপারগ হয়ে সরকার ও কর্তৃপক্ষ শোষিত জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য কর্মসংরক্ষণের নীতি নিয়ে থাকেন যার ফলে এক ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যেন এই উপায়েই দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করা যাবে। এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে দলিত অংশকে বিভ্রান্ত করে বুর্জোয়া জমিদার পরিচালিত সরকারের নীতির স্বপক্ষে তাদের টেনে আনা। অবশ্য ভারতের বিশেষ অবস্থায় সবচাইতে পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য কিছু সুবিধা দান এবং আরক্ষণ নীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা অন্যায় হবে, সংগে সংগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্তব্য হবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং সমস্ত অংশকে বোঝান যাতে তারা আরও ঐক্যবদ্ধভাবে বেকারী ও দারিদ্র্যের বিভীষিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। জনগণের বঞ্চিত ও দলিত অংশকে বুঝিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ করতে হবে যে সরকারী কিছু সুবিধার ব্যবস্থা সামান্য একটু আরাম দিতে পারে মাত্র কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া সমস্যার অন্য কোন প্রকৃত সমাধান নেই। সমস্যা তাই দ্বিমুখী—প্রথমতঃ যারা কর্মহীন এবং যারা কর্মে নিযুক্ত তাদের মধ্যে একতার সৃষ্টি করতে হবে, অন্যদিকে যে সমস্ত কর্মহীন জনগণ জাতপাত ও আঞ্চলিকতার প্রভাবে বিভক্ত হয়ে আছে তাদের সকলকে এক ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করা। যদি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই দায়িত্ব গভীর আগ্রহের সংগে গ্রহণ না করে তবে শাসকশ্রেণী বেকারীর উপর ক্রোধকে ভ্রাতৃঘাতী দাংগার খাতে বইয়ে দিতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি

এই প্রসংগে বলে রাখা ভাল যে ছোট ছোট উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরি করে ও ছোট শিল্প গঠন করার ভিত্তিতে জনতা সরকারের সমস্ত মানুষের জন্য কাজ যোগাড়

করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বিভ্রান্তিমূলক। ক্ষুদ্র শিল্প পুনরুজ্জীবিত করে জনতা সরকার সমৃদ্ধির যে আশা দিচ্ছেন তা এক অলীক স্বপ্ন এবং দারিদ্র্য ও স্বল্প উৎপাদনের ব্যবস্থাপত্র মাত্র। এই প্রচেষ্টা উৎপাদনের উপকরণগুলি জাতীয়করণ—একচেটিয়া বৃহৎ শিল্পগুলি জাতীয়করণ করে সেগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। অধিকন্তু এই প্রচেষ্টা আসলে কৃষকের দারিদ্র্যের মূল কারণ বর্তমান ভূমি সম্পর্ক লুপ্ত করার পথ থেকে পালিয়ে যাওয়ার অছিলা মাত্র।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই, যাদের পুরোভাগে হল সোভিয়েট ইউনিয়ন, তারাই বেকারী সমস্যার সমাধান করেছে। তারা এ কাজ করেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র শক্তিগুলির হাতে এনে, উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের নিয়ন্ত্রণে এনে, সমস্ত প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক খতম করে দিয়ে; তারপর দ্রুত শিল্পায়নের মধ্যে যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদনক্ষেত্রগুলির উৎসাদিত মানুষদের কাজ দেওয়া সম্ভব ছিল। বর্তমান শাসকদল এ বছরের রাষ্ট্রপতির ভাষণে আবিষ্কার করেছে যে এই সরকারের সংগে আমেরিকার মৌলিক মূল্যবোধগুলির ঐক্য আছে, এই অবস্থায় অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে তাদের শেখার কিছুই নেই।

এ কথা অবশ্যই সঠিক ও দরকারী যে কুটীর ও ছোট শিল্পগুলিকে এবং কৃষিকে অন্তর্বর্তীকালে রক্ষা করে সহজভাবে আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহৎ শিল্পের অসম প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে; সংগে সংগে এটাও সমভাবে জরুরী যে দেশের অমিত শ্রমশক্তিকে বহুল প্রয়োগ করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৃত রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন করতে হবে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পের এক চিরস্থায়ী ভূমিকা থাকবেই—এই বক্তব্য শুধু ভুল নয় প্রতিক্রিয়াশীলও বটে। একথাও প্রতিক্রিয়াশীলদেরই কথা যে দারিদ্র্য ও বেকারীমুক্ত সমাজ বৃহৎ শিল্পের ভূমিকাকে হ্রাস করে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর প্রাথমিক ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে।

কুটীর শিল্পই প্রাথমিক ভিত্তি, এই ব্যবস্থা ভারতের দারিদ্র্য ও চিরন্তন বেকারীর সংগে অন্যান্য কুফলকে চিরন্তন করে রাখারই ব্যবস্থাপত্র। তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব এমনভাবে বলা হয় যে বড় শিল্পগুলির কুফল ছাড়া আর কিছু নেই। এই বক্তব্য পুঁজিবাদী মালিকানার কুফলের সংগে

শিল্পের বৃহত্ত্বকে এক করে দিয়ে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এরা আধুনিক শিল্পের মধ্যে বিজ্ঞানে ও উৎপাদনে মানুষের বিজয় গৌরবের চিহ্ন দেখতে পায় না বলে পশ্চাদপদ এক স্বপ্নের স্বর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এর ফলে বৃহৎ মালিকানার স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ব্যবস্থাকে পবিত্র করে তোলা হয়।

এটা জানা কথা কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা খুবই নগণ্য, অন্য দিকে সামাজিক মালিকানার শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম উন্নতিগুলিকে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে; অন্যদিকে প্রথমটি (কুটীর ও ছোট শিল্প) শ্রমিকের উপর দৈনন্দিন একঘেয়েমি চাপিয়ে দিয়ে এক নগণ্য আয়ের পথ খুলে দেয় মাত্র। হস্তচালিত তাঁত, কুটীর শিল্প ও অন্যান্য ছোট শিল্পের উৎপাদনের ক্ষমতা এত কম যে উৎপাদনকারী দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রচেষ্টা হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উৎপাদনকারীকে বর্তমান নরক থেকে মুক্ত করে আধুনিক প্রযুক্তির উচ্চগতিতে নিয়ে আসা। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাগুলি, যেগুলি তাদের বাঁচার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলি নরকের কষ্ট খানিকটা লাঘব করে মাত্র কিন্তু নরক থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে না। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সামাজিক মালিকানায় বৃহৎ আধুনিক শিল্পের উপর নির্ভর করছে।

জনতা দলের কোন কোন নেতা মাঝে মাঝে কোন বিশেষ একচেটিয়া পুঁজিপতির বৃহৎ শিল্প অধিগ্রহণ বা জাতীয়করণের কথা বলেন। এগুলি স্রেফ চাপ সৃষ্টি করার জন্যই বলা, জাতীয়করণ সম্বন্ধে খাঁটি ও স্পষ্ট মনোভাব এই উক্তিতে ধরা পড়ে না। কিছুদিন আগে এক মন্ত্রী টাটাদের মালিকানাধীন টিস্কো অধিগ্রহণের কথা বলেছিলেন। এই সমস্ত ঘোষণাই কংগ্রেসের মত টীকা সম্বলিত অর্থাৎ এই ঘোষণা বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত, এর কোন আদর্শ বা নীতিগত ভিত্তি নেই—যার মানে তাদের ঘোষণাকে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই।

সি. আই. টি. ইউ. একচেটিয়া পুঁজির সমস্ত শিল্পকে জাতীয়করণের পক্ষে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত জনতা সরকারের যে কোন প্রকৃত ব্যবস্থাকে তারা সমর্থন করবে। এই প্রসঙ্গে তাদের দাবী যে জাতীয়করণ মানে আমলাতান্ত্রিকরণ হবে না, শিল্প চালনায় শ্রমিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয়করণের নামে শিল্পকে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রি বা হস্তান্তর চলবে না—যেমন কর্তৃপক্ষের উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ ও

শিল্প মন্ত্রীর মার্জনার সুরের অন্তরালে বি. এইচ. ই. এল.-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে মনে হয়।

কমরেডস্, পশ্চিমবংগে শিল্প শ্রমিকদের জন্য বেকারী ভাতার এক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাদের সুযোগ্য কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে আমরা সবাই অভিনন্দন জানাই। যদিও বর্তমানে এই সব প্রকল্প অল্পসংখ্যক বেকারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা গেছে তবু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির স্বীকৃতি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যদি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে রাজি হতেন তবে বামফ্রন্ট মন্ত্রীপরিষদ নিশ্চয়ই বেকারী ত্রাণের একটি সর্বাংগীণ পরিকল্পনা রচনায় সফল হতে পারতেন, এই বৎসরে এই পরিকল্পনার পরিসর আরও প্রশস্ত করা হয়েছে।

কমরেডস্, গ্রামীণ কর্মহীনতা এমনই একটি সমস্যা যা সরকার আর বেশিদিন উপেক্ষা করতে পারেন না। কোন কোন রাজ্যসরকার আংশিক ত্রাণ ও কর্ম-সংস্থানের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। মহারাষ্ট্র সরকারের, কাজকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা, এই রকমেরই একটি পরিকল্পনা এবং এটা অতি আশ্চর্যের বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতিকে এই ব্যবস্হার সম্মতি দিবার অনুরোধ করতে এত দীর্ঘ সময় নিয়েছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি সম্মিলিতভাবে এই প্রশ্নকে গ্রহণ করেন তবে তারা গ্রামে এবং শিল্পে বেকারদের বেশ খানিকটা ত্রাণের ব্যবস্হা করতে পারবেন।

দ্রব্যমূল্য ও সরকারের নীতি

কমরেডস্, জনতা সরকার মিথ্যা দাবী করেছেন যে তারা দাম কমিয়েছেন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে কৃতকার্য হয়েছেন। মনে হতে পারে যে জনতা সরকার যেন দারুণ মুদ্রাস্ফীতির বৎসরগুলিতে, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫, জিনিসের মূল্য যে তুংগে উঠেছিল তা থেকে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। কিন্তু বাস্তব এই যে জনতার রাজত্বে কোন সুরাহা তো ঘটেই নি বরং জরুরী অবস্হার আগের মুদ্রাস্ফীতির বছরগুলিতে যে দাম ছিল তারচেয়ে দাম আরও বেড়েছে। আমি এখানে রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রা ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে কতগুলি অংক উধৃতি দিচ্ছি :

পাইকারী মূল্য-সূচক

	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
সমস্ত পণ্য ১৯৭০=১০০	১১৬·২	১৩৯·৭	১৭৪·৯	১৭৩·০	১৭৬·৬	১৮৫·৬
খাদ্যদ্রব্য	১১১·৩	১৩৬·৬	১৭২·১	১৬৩·৬	১৫৫·৩	১৭৩·৪
ভোগ্যমূল্যের সূচক সারা ভারত শিল্প শ্রমিক ১৯৬০=১০০	২০৭	২৫০	৩১৭	৩১৩	৩০১	৩২৪

১৯৭৯, ১৩ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় পাইকারী মূল্য-সূচক সংখ্যা ছিল ১৮৫·১, ১৯৭৮ আগস্টে শিল্প শ্রমিকের ভোগ্য মূল্য-সূচক ছিল ৩৩১ ; সেপ্টেম্বরে ৩৩৬ এবং অক্টোবরে ৩৪০।

জনতা সরকারের অযৌক্তিক দাবীর মুখোস খুলে সত্য কথা বেরিয়ে পড়েছে। এই দাবী করার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করানো যে শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চতর মহার্ঘ ভাতার ও মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।

সাধারণ মানুষের প্রয়োজন, গত কয়েক বছরে যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তার যথেষ্ট হ্রাস ঘটানো। জনতা সরকার তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এদের দুই বৎসরের শাসনে দাম আগের চেয়েও বেড়েছে।

এই ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল কারণ কংগ্রেস সরকারের পদাংক অনুসরণ করে তারা কুখ্যাত ডেফিসিট ফিনান্সিং (নোট ছাপানো)-র পথ গ্রহণ করেছিল। বিগত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০০০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় দ্রব্যমূল্য কমার কি সম্ভাবনা ছিল ?

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে (১৯৭৭-৭৮) মন্তব্য করা হচ্ছে, "প্রথমতঃ অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ বেড়েই চলেছে, এই বৎসর হচ্ছে শতকরা ১৮·৪ ভাগ, গত বৎসর ছিল শতকরা ১৬·৬ ভাগ। উৎপাদন বা জাতীয় আয় বাড়ানোর জন্য এর কোন প্রয়োজন ছিল না।" "বৃদ্ধির এই হার, প্রকৃত জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে।"

সংক্ষেপে, ডেফিসিট ফিনান্সিং (নোট ছাপানো) ও চড়া দাম, যাদের কিছু নেই তাদের ক্রয় ক্ষমতাকে লুণ্ঠন করে, যাদের আছে তাদের হাতে চালান

করার এক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমনটি কংগ্রেসের যুগে করা হত। খুব বেশি হলে জনতা সরকার মাত্র এইটুকুই দাবি করতে পারে যে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের দিনগুলির তুলনায় মূল্য বৃদ্ধির হার স্তিমিত করতে সক্ষম হয়েছে, এবং এর ফলেও যে সব কৃষক বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করে তার এক বড় অংশ ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে।

ধর্মঘট ও লক-আউট

কমরেডস্, আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রশ্নের উত্থাপন করছি। পুঁজিবাদীদের মুখপাত্ররা ধর্মঘটের বিরোধিতায় পরস্পরের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ধর্মঘটে কত লোকসান হল তার বিজ্ঞাপনে ব্যস্ত, কিন্তু যথেচ্ছ লক-আউটের ফলে উৎপাদনের কতটা ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে নীরব থাকে। ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায্য অধিকার রক্ষার একটি হাতিয়ার; তাদের জীবন-যাত্রার মানের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে ধর্মঘট একটি অস্ত্র। লক-আউট হচ্ছে মুনাফালোভী শোষকশ্রেণীর, শ্রমিককে অনাহারে রেখে বশে আনবার অস্ত্র, এর ফলে উৎপাদনের কত ক্ষতি হল তার সম্বন্ধে তাদের পরোয়া নেই। প্রথমটিকে নিন্দা করা হয় কারণ এটা শ্রমিকেরা ব্যবহার করে; লক আউট সম্বন্ধে নীরবতা পালন করা হয় কারণ সেটা পুঁজিবাদীদের স্বার্থে করা হয়েছে এবং তাদের স্বার্থ নিন্দার ঊর্ধ্বে। নিম্নলিখিত অংকগুলি কয়েকদিন আগে সরকার সংসদে পেশ করেছেন।

সাল		জড়িত শ্রমিকদের সংখ্যা	নষ্ট শ্রমদিবস
১৯৭৬—জানু-জুন	ধর্মঘট	১৬৪,৫৭৬	১৪,৪৫,৬৮৪
	লক আউট	৭০,৬১২	৪১,৮৮,০০৬
১৯৭৭—জানু-জুন	ধর্মঘট	৫৬৭,৯৬১	৪৪,৮৭,১৮৫
	লক-আউট	১১৫,৭০০	৪০,১৪,০০৫
১৯৭৮—জানু-জুন	ধর্মঘট	৫৬৩,৩৮২	৫৮,৯৫,০০৪
	লক-আউট	১৩১,৬৮৪	৬৮,৩৭,৮১৪

লক-আউটের দীর্ঘস্থায়ী রূপটি এর ভিতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালে ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল লক-আউটে জড়িত শ্রমিকের দ্বিগুণ কিন্তু ধর্মঘটে যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে, লক-আউটে হয়েছে তার প্রায় তিনগুণ। ১৯৭৭ সালে লক-আউটে জড়িত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকের $\frac{1}{5}$, কিন্তু লক-আউটে বা ধর্মঘটে যে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার সংখ্যা প্রায় সমান। আবার ১৯৭৮ সালে, লক-আউটে জড়িত শ্রমিকের

সংখ্যা ছিল ধর্মঘটীদের ½, কিন্তু নষ্ট শ্রমদিবস সংখ্যা ধর্মঘটের চেয়ে লক-আউটে প্রায় শতকরা ১৫ থেকে ১৭ ভাগ বেশি। কিন্তু সরকার যদি লক-আউটের তীব্রতা স্বীকার করে এগুলিকে অসামাজিক এবং জাতীয় উৎপাদনের বিরুদ্ধাচারী বলে ঘোষণা করতেন তবে সরকারকে শ্রেণী সরকার বলা যেত না। শিল্প সম্পর্ক বিলে কি তারা ধর্মঘট ও লক-আউটকে সমপর্যায়ে ফেলে শুধু ধর্মঘটকেই নিষিদ্ধ করছে না?

কমরেডস্, শুরু থেকেই জনতা সরকারের কর-নীতি সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা লাঘব করার প্রয়াস নেয়নি। তাদের পূর্বতন সরকারের মতই জনতা সরকারও কর-নীতিকে সাধারণ মানুষকে ভোগ্য পণ্য থেকে বঞ্চিত করবার একটি ব্যবস্থা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, এমন কি সদিচ্ছা প্রণোদিত দৃষ্টান্তেও গরীবদের উপর করের বোঝা বাড়ানোর ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। তাঁর সীজন টিকিটের উপর ভাড়া বাড়ানো কলিকাতা, বোম্বাই প্রমুখ অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারী, যাত্রী সাধারণের উপর এক বোঝা চাপিয়ে দেবে। টাকার মূল্যে এই বোঝার অংক ২৮ কোটি টাকার কম নয়। জনতা সরকারের পূর্বতন বাজেটও সাধারণ মানুষের উপর কর বৃদ্ধি করে বড় ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু ছাড় দিয়েছিল। ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটও এই বোঝাকেই বৃদ্ধি করেছে। কার্ল মার্কস-এর কথাগুলি স্মরণ রাখলে কর বৃদ্ধির এই দানবীয় চরিত্রকে বোঝা সহজ হবে। "বর্তমান রাজস্ব ব্যবস্থা যার মেরুদণ্ড হল প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের উপর কর স্থাপন (যার ফলে জিনিসের দাম বেড়ে চলে), এই কর স্থাপন ব্যবস্থার মধ্যেই নিজে নিজেই বেড়ে চলার বীজ নিহিত রয়েছে। বেশী কর বৃদ্ধি আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটা একটা নীতি। এই ধ্বংসকারী ব্যবস্থার প্রভাব শ্রমিকদের উপর যতটা নয় তার চেয়ে কৃষক ও কারিগর শ্রেণী, এক কথায় সমস্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই শোষণ করে।" কর বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সংগে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সম্প্রসারণ, কারিগর ও কৃষকদের উচ্ছেদ, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ ত্বরান্বিত করেছে। এজন্যই বেকারী সমস্যা ক্রমে ক্রমেই বীভৎস হয়ে উঠছে।

অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা

জনতা সরকার নূতন উদ্যমে সেই নীতিগুলিই চালিয়ে যাচ্ছেন যা আমাদের পশ্চিমী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল করে তোলে। আত্মনির্ভর অর্থনীতির ধ্বনির বদলে নূতন ধ্বনি উঠছে—আরও অধিক রপ্তানী চাই।

বিশ্বব্যাংক আমাদের অর্থনীতি যাতে পশ্চিমী ব্যবস্থার সংগে যুক্ত থাকে তার জন্য সদাসতর্ক এবং তারা রপ্তানী বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়ে চলেছে, ইন্দিরা গান্ধী এই চাপের সামনে সচ্ছন্দে উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে রপ্তানী ও বিরাট ভরতুকি দিয়ে রপ্তানীর নীতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে জনগণকে শত শত কোটি টাকা মাশুল দিতে হয়েছে। আজ জনতা সরকার সেই নীতিকে অব্যাহত রেখেছে।

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসের কাছাকাছি বিশ্বব্যাংক দাবী রেখেছিল যে ভারতকে তার শিল্পোন্নয়ণের নীতি ঢেলে সাজাতে হবে, ভারী শিল্প ও যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প ছেড়ে দিয়ে আগামী দশকে বৃহৎ রপ্তানী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তারা বলেছিল, রপ্তানী ও বড়ো আকারের বিদেশী সাহায্যই তার পুঁজির বড়ো অংশ হয়ে উঠবে যা দিয়ে ভারত তার পতনোন্মুখ শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে পারবে। জনতা সরকার ইন্দিরা সরকারের পদাংকই অনুসরণ করে চলেছেন, তফাৎ এই যে তারা মিথ্যার আড়ালে সে আদেশ মেনেই চলেছেন, অবশ্য এর সংগে গান্ধীবাদের মূল্যবোধের ঝুড়ি ঝুড়ি কথা মাঝে মাঝে জুড়ে দিচ্ছেন। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, দৃষ্টিকে গ্রামমুখী করা, বৃহৎ শিল্পের প্রতি—আক্রমণ এসব দিয়ে গলাবাজীর অন্তরালে তারা বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত কথাগুলিরই সারমর্মটুকু ভারতীয় দর্শকদের কাছে নিবেদন করেছেন।

এর ফলে ব্যক্তিগত পুঁজির স্বাধীনতা বেড়ে গেছে এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সুবিধাদানের দাবিও শক্তি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ভারতবর্ষে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজির সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ওকালতি করে আসছে এবং জনতা সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি বিচার করলে দেখা যাবে দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি উৎসাহ পাচ্ছে। এই ঘটনা এক নূতন বিপদের সৃষ্টি করছে ও সমানভাবেই এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক ইংগিত বহন করছে। বৈদেশিক বাজারে রপ্তানীর জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টার এক অভিব্যক্তি হল বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতি সংস্থার সংগে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের অধীনে তৃতীয় বিশ্বে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদারের কাজ পাওয়ার প্রচেষ্টা।

এর ফলে নূতন অর্থনৈতিক স্বার্থ সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভরতুকি দিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানীর ব্যাপারে উদার নীতি গ্রহণ করা ও বিদেশে তার সুবিধা পাওয়ার আশার পিছনে একটি অর্থই লুকিয়ে আছে তা হল ভারতে ও বিদেশে বিদেশী পুঁজির অংশীদার হওয়ার প্রচেষ্টা। এই ঘটনাক্রমের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক বিপদ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কমরেডস্, আমাদের শ্রমিকশ্রেণী এখনও উপযুক্তভাবে হৃদয়ংগম করেনি যে বিশ্বব্যাংক সাম্রাজ্যবাদের নীতির যন্ত্র হিসাবে কাজ করে এবং অনুন্নত দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক ব্যবস্থার অধীন করে রাখার জন্যই সাহায্য দানকে ব্যবহার করে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সংগ্রাম করতে অক্ষম।

নির্যাতন

কমরেডস্, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে জনতা সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রমিক শ্রেণীর আশু দাবীগুলির বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। সংসদ নির্বাচনে জনতার বিজয়ের পর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী ও আমাদের সি.আই.টি.ইউ. গত দু'বছর কি অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে, প্রতিবেদনে তার একটি পূর্ণাংগ চিত্র রয়েছে। আমাদের সকলেই শিল্প সম্পর্কিত বিলকে ধিক্কার জানাই। শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিলকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিল জরুরী অবস্থার বে-আইনী কার্যকলাপকেই আইনসম্মত করার চেষ্টা করেছে। আর একটি বিল শিক্ষক, নার্স প্রভৃতিদের ধর্মঘট বে-আইনী করতে প্রস্তাব করছে এবং এটা ইন্দিরা সরকারের কার্যকলাপকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে এক বৃহৎসংখ্যক ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের দমন করতে বে-আইনী অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কেরালা সরকারও বিদ্যুৎকর্মী ও অন্যান্যদের উপর নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে দোষী।

সরকারী শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের দাবীকে প্রতিহত করা হচ্ছে; ব্যুরো অব্ পাবলিক সেক্টর এস্টারপ্রাইজেস সংস্থাটি ইচ্ছামত ব্যবহার করে অনেক অর্থপূর্ণ আলাপ-আলোচনাকে বিঘ্নিত করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তারা যা উচিত মনে করেন তা গ্রহণে বাধ্য করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জুন মাসে শ্রমমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থাগুলির কর্মচারীদের সংগে আলোচনাকালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন তার থেকে পিছিয়ে গেছেন। কোটা এটমিক প্ল্যান্টে যে চুক্তি হয়েছিল তাও তিনি ভেংগেছেন। এর আগের কোন শ্রমমন্ত্রী সম্ভবতঃ শ্রমিকদের কাছে প্রকাশ্যে নিজের কথার খেলাপ করার মত দৃষ্টান্ত রাখেননি।

সুতরাং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীকে একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—মহার্ঘভাতা, প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী,

বোনাস, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, লে-অফ এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ভংগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

কমরেডস্, আমাদের সি. আই. টি. ইউ. কর্মী ও শ্রমিকদের সম্মুখে আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে—সে হচ্ছে মালিকদের ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ, যার পিছনে পুলিশ মদত দিচ্ছে। সমাজবিরোধীদের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, বিশেষ করে ধর্মঘটের সময় তাদের ব্যবহার করা মালিকশ্রেণীর এক অভ্যস্ত পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর গুন্ডাবাহিনী প্রয়োজনের সময়ই গড়ে তোলা হয় না, অনেক স্থানে তারা মালিকদের সদা-প্রস্তুত সৈন্যবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রায়ই বলা হয় তারা ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড কর্মী এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, যেগুলি তারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এবং অন্যান্য স্থানে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। হারিয়ানায়, ফরিদাবাদে ও অন্যান্য স্থানে এই বাহিনীকে সি. আই. টি. ইউ-র বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

ফরিদাবাদে, গাজিয়াবাদে, রাজস্থানে আমাদের কমরেডগণ সাহসের সংগে এদের মোকাবিলা করছে। আমাদের আক্রমণকারীরা নরহত্যায়ও পরাঙ্মুখ নয়। আমাদের বেশ কয়েকজন কমরেড তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। রাজস্থানে আমাদের কমরেডদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনের গুন্ডাদের সম্মুখীন হতে হয় যারা দাবী করে যে তারা কোন সর্বভারতীয় সংগঠনের সংগে যুক্ত যাদের সংগে আমাদের সৌভ্রাত্র্যের সম্পর্ক রয়েছে। রাজস্থানে আমাদের আক্রমণকারীরা দাবী করে তারা আই. এন. টি. ইউ-সির অনুগামী; ভিলাইয়ে দাবী করে তারা বি. এম. এস-এর অনুগামী। আমাদের এই সংগঠনগুলির কাছে আবেদন যে তারা যেন মালিকের পক্ষপুষ্ট এই দলের সংগে তাদের সম্পর্ক অস্বীকার করেন।

মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে আমাদের যে কমরেডগণ অসম সাহসে, মহান আত্মত্যাগের সংগে সি. আই. টি. ইউ-র পতাকা বহন করে চলেছেন, আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

কমরেডস্, সি. আই. টি. ইউ. এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার এই গুন্ডাদের নিরস্ত করার দাবী করা উচিত। দাবী ওঠা উচিত যে মালিকদের পোষ্যদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করা হোক। কাউকেই এই ধরনের ব্যক্তিগত বাহিনী রাখকে দেওয়া উচিত নয়।

কমরেডস্, এই মাদ্রাজ শহরে, যেখানে আমরা মিলিত হয়েছি সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে দালাল ও ভাড়াটে গুন্ডাদের ব্যবহার অপরিচিত

নয়। শ্রী এম জি রামচন্দ্রণ পরিচালিত তামিলনাড়ু সরকার, তামিলনাড়ু বন্‌ধের সময় বর্বর নির্যাতনের পথই শুধু নেন নি তাদের দালালদের দিয়ে শ্রমিকদের উপর আক্রমণও চালিয়েছেন। তামিল নাড়ু বন্‌ধের সময় এরা এরা সংগে আমাদের ৩০০০ কর্মী ও শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তার পর থেকে তারা ধর্মঘট বিরোধিতার পথ গ্রহণ করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পেশীর জোর ব্যবহার করতে শুরু করেছেন; অন্যদিকে যে-সকল মালিকেরা তাদের নির্দেশ উপেক্ষা করে তাদের কাছে তাদের ব্যবহার স্তাবকের মত।

টি. ইউ. প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কমরেডস্‌, জনতা শ্রমমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রক কংগ্রেসী অস্ত্রাগার থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের সমস্ত অস্ত্রগুলি ধার নিয়েছেন। কংগ্রেস শাসকরাই এটা আবিষ্কার করেছিলেন যে ভারতে ধর্মঘটের কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং বর্তমান শ্রমমন্ত্রীও যখনই শ্রমিকরা সরকারের নীতির বিরোধিতা করে বা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তখনই ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বহু ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন।

কংগ্রেস সরকার অন্ততঃ এই সব অভিযোগ করতেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি যখন আশু দাবীতে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ও বিভক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান শ্রমমন্ত্রী এই সব মন্তব্য করেছেন সেই সময় যখন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমেই বেশী ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। শ্রম সম্পর্ক বিলের বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে তা একমাত্র শ্রমমন্ত্রী ছাড়া অন্য সকলের কাছেই আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ঐক্যই প্রকাশ করেছে।

এ কথা সত্য যে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বহু। এই ইউনিয়নগুলির অনেক প্রশ্নেই দৃষ্টিভংগিরও পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে রেল ধর্মঘটের সময়, পশ্চিমবংগে চটকলে ধর্মঘটের সময় তারা মতপার্থক্য দূরে রেখে একই কার্যপদ্ধতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

ইউনিয়নের সংখ্যাধিক্যের কারণ এই যে বেশির ভাগ মালিক ও সরকার যৌথ দরকষাকষি ক্ষেত্রে শুধু তাদের আজ্ঞাবহ পেটোয়া ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দিতেন। স্বীকৃত ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের আড়াল করে চুক্তি সই করে শ্রমিকদের বিশ্বাস হারাত। শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি ইউনিয়ন মেনে নেওয়ার পর শ্রমিকরা এই কথা জেনে শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী

এই চুক্তিগুলি মানতে অস্বীকার করত। কংগ্রেস সরকার তখন বলতেন —এসব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। পুঁজিপতিরা এই বক্তব্যকে তাদের মুখপত্র সংবাদপত্রে রং ফলিয়ে প্রচার করত এবং তাদের সংবাদপত্র আজও তাই করছে।

সি. আই. টি. ইউ. এবং আরও কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন দাবী করেছে যে সমস্ত শ্রমিকের গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হোক। আমরা এক শিল্পে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে সংগঠিত একটি ইউনিয়নের পক্ষপাতী। গত দুই বছরে জনতা সরকার, যারা গণতন্ত্রের রক্ষক বলে দাবী করেন, কেন এই মূলতঃ গণতান্ত্রিক প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করতে পারলেন না? শ্রম সম্পর্ক বিলও স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে, ব্যালটকে একটি বাধ্যতামূলক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেনি। এই আইনে সরকারকে অনুসন্ধান বা ব্যালটের যে কোন একটি উপায়ে স্বীকৃতি নির্ধারণ করবার ক্ষমতা দিয়েছে—অর্থাৎ আমলাতন্ত্র উপায় দুটির যেটি তাদের নিজের প্রিয়জনকে সাহায্য করবে সেটিই গ্রহণ করতে পারবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অধুনা ডাক ও তার মন্ত্রী এক নূতন সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন যাদের অনুগামীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এর কারণ এই সংগঠনের নেতারা তার দলের লোক। গণসমর্থনপুষ্ট অন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এই বিভক্তকরণের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই সমস্ত লোকেরাই, যখন তাদের সুবিধা মনে হয়, তখন ইউনিয়নের সংখ্যাধিক্য ও আন্তঃইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিন্দা করে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।

কে দায়ী?

কমরেডস্, এই প্রসংগে আমি আর একটি নিন্দাজনক প্রচারের উল্লেখ করছি। কিছুদিন আগে একজন মালিক তার ভাড়াটে লোকের আক্রমণের শিকার হন। তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। সংগে সংগেই বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি, পুঁজিবাদীরা, শোষণে অভ্যস্ত একদল মানুষ এবং তাদের ভাড়াটেরা ট্রেড ইউনিয়নের উপর দোষ চাপিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করতে লাগল সে আন্তঃ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই আক্রমণের কারণ। আমরা মাঝে মাঝেই এই ধরনের ঘটনা শুনি। এই সব ঘটে কেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ, মালিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া শাসক দল প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে নীতিজ্ঞানহীন লোকদের নিযুক্ত করেন, তাদের বিশেষ সুবিধাদান করে থাকেন। এই বিবেকবর্জিত অথবা সমাজ-বিরোধীদের কর্তৃপক্ষ

'নেতার' সম্মান দিয়ে থাকেন এবং তাদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দান করেন। নিজেদের জন্য কাজ গুছিয়ে নেওয়াই এদের একমাত্র স্বার্থ এবং এদের সংগে যখন কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধে তারা সেই দাওয়াই গ্রহণ করে যা তাদের শ্রমিকদের উপর ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলনের সামনে এটা এক নূতন বিপদ। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়

কমরেডস্, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কার্যতঃ কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে বিযুক্ত করায়, গ্রামীণ মানুষকে আমাদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের অংগীভূত করে তাদের দাবীকে উচ্চে তুলে ধরবার অক্ষমতা শুধু দুটি আন্দোলনকে দুর্বলই করেনি উভয়ের জন্য নূতন বিপদ সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক তথ্য প্রমাণ করে যে যেখানে সংগঠিত শ্রমিকেরা সংগ্রাম করে জীবনযাত্রার মান খানিকটা বজায় রাখতে পেরেছে সেখানে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকেরা সংকটের নির্দয় শিকারে পরিণত হয়েছে। কৃষি-শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া ও কৃষকের উচ্ছেদ এ কথাই প্রমাণ করে।

কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের দরিদ্রতম জীবনে ঠেলে দেওয়ার পর, জমিদার, পুঁজিপতি ও তাদের মুখপাত্ররা এখন শহরের দরিদ্র শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ মানুষকে লেলিয়ে দেবার চেষ্টায় হাত মিলিয়েছেন। টাকার অংকে তাদের মজুরীর হিসাব তুলে তারা দেখাতে চান শহরের শ্রমিক-কর্মচারীরা কি সচ্ছল্য আছেন; তাদের প্রকৃত আয় যে কমে গেছে এ তথ্যটি অবশ্য তারা গোপন রাখেন। ভাড়াটিয়া অধ্যাপকদের কাজে লাগিয়ে তারা প্রমাণ করতে চান যে শ্রমিক কর্মচারীরা এক সচ্ছল শ্রেণী এবং তারা কৃষকদের শোষণ করে।

তারা নির্লজ্জভাবে এই তথ্যটি গোপন রাখেন যে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের অধোগতির কারণ জমির মালিকদের শোষণ, ভূমি সম্পর্ক নিহিত শোষণ, এবং পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ প্রসূত শোষণ। চরণ সিং প্রভৃতির দল এটা শহর ও গ্রামের মানুষের প্রশ্ন হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তারা ইচ্ছাকৃত-ভাবে শ্রমিক, কর্মচারী ও বস্তিবাসীদের সংগে শহরের একচেটে পুঁজিপতি ও ধনীদের এক করে দেখবার চেষ্টা করেন। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এদের সুরেই কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন শ্রমিকদের অধিক মজুরী দাবী করা উচিত নয় কারণ তারা গ্রামের মানুষের তুলনায় অনেক বেশী উপার্জন করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এই অপপ্রচারকে গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করতে হবে কারণ এটা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে এবং এর উদ্দেশ্য শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শোষিত অংশকে লেলিয়ে দেওয়া।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে এই দুটি শক্তির মৈত্রী গরীব কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের দাবীকে সমর্থন করে দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে, জমিতে একচেটিয়া জমির মালিকানার বিলোপের দাবী তুলতে হবে এবং কৃষকদের জন্য নায্য মূল্যের দাবী ওঠাতে হবে এবং কৃষি-শ্রমিকদের সংগঠিত করার কার্যকরী পথ গ্রহণ করতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর সহানুভূতি ও সংহতি অর্জন করে শ্রমিকশ্রেণী অনেক বেশী অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে। আজ যখন শাসকশ্রেণী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে লিপ্ত, তখন এই কথা বিশেষভাবে সত্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভূমি সমস্যার একমাত্র সমাধান জমিতে জমিদারদের একচেটিয়া মালিকানা ভেংগে দেওয়া এবং চাষীর হাতে জমি বিতরণের ফলে শহরে কর্মসংস্থানের উপর চাপ কমাবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই দাবীগুলি সম্বন্ধে সোচ্চার হওয়ার উপর শহরে ও কারখানায় চাকুরীর নিরাপত্তা অনেকটা নির্ভর করবে। ট্রেড ইউনিয়নকে শুধু কৃষকদের সাধারণ দাবী-দাওয়ার কথা তুলে ধরলেই চলবে না, তাদের কাজ হবে গ্রামের হরিজনদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা। তারা যদি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে চান তবে তাদের সবচেয়ে দলিত অংশের দাবীকে তুলে ধরতেই হবে।

জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অবাঞ্ছিত। ট্রেড ইউনিয়নকে আর. এস. এস এর মত পুনরুত্থানধর্মী মতবাদকে বিরোধিতা করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ দমনে সংগ্রাম করতে হবে। এর সংগে কৃষকদের দাবীগুলিকে তুলে ধরতে পারলেই গ্রামীণ জনগণের এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ার এক ভিত্তি গড়ে উঠবে।

বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুটি চালিকাশক্তির সহযোগিতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করছে এই দুই শক্তির মৈত্রী ও সহযোগিতা একটি বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পথ প্রশস্ত করছে। সেই সময় এসে গেছে যখন আমাদের সি. আই. টি. ইউ. ও আমাদের

ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হবে আমাদের কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের বহু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নেতা সর্বভারতীয় কিষান সভার সংগে এক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়ে তোলা।

শ্রমজীবী নারী

কমরেডস্, সি. আই. টি. ইউ-র বোম্বাই অধিবেশনে শ্রমজীবী নারীদের এক সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গতকাল সেই সম্মেলন তাদের আলোচনা শেষ করেছে। ইউনিয়ন ও কমিটিগুলির কাজ হবে এর সিদ্ধান্তগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যে রূপায়িত হয় তা দেখা।

সি. আই. টি. ইউ-কে এই বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল কারণ দেখা গিয়েছিল যে নারী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে; সরকার এই ব্যাপারে নিরাসক্ত; মালিকেরা এর বিরোধী; এবং এমন কি ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাঁদের দাবী সম্বন্ধে উৎসাহহীন। শ্রমিকশ্রেণী যে অসংখ্য সংগ্রাম করেছে তাতে নারী শ্রমিকদের দাবীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন উদাহরণ খুবই কম পাওয়া যাবে।

এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, এমন কি যে সমস্ত শিল্পে ও বৃত্তিতে নারী শ্রমিকরা এক বৃহৎ অংশ হয়ে কাজ করেন সেখানেও ইউনিয়নের কোন নেতৃস্থানীয় পদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নগণ্য।

এই অবস্থার আংশিক দায়িত্ব ভারতবর্ষের সমাজে নারীদের যে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নারীকে যে হীনতর অবস্থা প্রদান করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। এই বৈষম্য নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সত্য এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রাথমিক দায়িত্ব হল এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। আমরা বলতে পারি না যে আমাদের কিছু কিছু শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভংগি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

লক্ষ্য করা গেছে মালিকেরা নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন সুবিধা ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদান এড়াবার জন্য তাদের ছাঁটাই করে থাকেন। অনেক শিল্পেই নারী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ছাঁটাইয়ের খড়্গ প্রথমে নারী শ্রমিকদের উপরই নেমে আসে।

কুখ্যাত বাভেগা কমিটি কয়লা শিল্পে ৫০,০০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করার সুপারিশ করেছেন। কমিটি বলেন "এদের এক বিরাট অংশ নারী শ্রমিক যাদের খনির অভ্যন্তরে কাজ করবার জন্য পাঠানো যায় না। খনির কাছাকাছি অন্যান্য প্রকল্পে নারী শ্রমিকদের বাদ দিয়ে, শিক্ষণের এক কর্মসূচীর

মাধ্যমে নূতন বিন্যাস সম্ভব" —এর অর্থ নারীগণ প্রতিদিন ছাঁটাই হতে থাকবেন, এবং জনতা সরকারের শক্তিমন্ত্রী এই সুপারিশ কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর।

কংগ্রেসী সরকারের আমলে ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬১-৬২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩,৭০ ০০০; ১৯৬৮তে সংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৬২ হাজারে। এই হ্রাসের পিছনে হয়ত টেড ইউনিয়নগুলির অবহেলা ও উপেক্ষা রয়েছে।

সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, এই প্রশ্নেও বৈষম্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। চা ও বিড়ি শিল্পের মালিককেরা নানা উপায়ে নারী শ্রমিকদের বঞ্চিত করে থাকেন। এই বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুরুষদের ব্যাপার হলে যে আগ্রহ দেখাতেন সব সময় তারা তা দেখাননি। বাগান শিল্পের, বিড়ি শিল্পের, ছোবড়া শিল্পের নারীরা এবং ঝাড়ুদার রমণীরা এই বৈষম্যের ফলে সব চেয়ে কষ্ট সহ্য করছেন।

সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরিতেও নারী কর্মচারীদের অবস্থা বিশেষ সুখের নয়। কারখানার নারী শ্রমিকদের মত ক্রেস ও অন্যান্য সুবিধা থেকে তারা তো বঞ্চিত হনই, পুরুষ শাসিত ব্যবস্থায় পদোন্নতি ও বদলির ব্যাপারে তাদের উপর বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতর অফিসারদের লালসার শিকারও তাদের হতে হয়। নিয়োগকর্তারা প্রসূতিকালীন সুবিধা দেওয়া এড়িয়ে যাবার জন্য হয় তাদের ছাঁটাই করেন অথবা চাকুরী দিতে অস্বীকার করেন। কারখানায় নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নারী কর্মীরা প্রায়ই বিবাহের পর কর্মচ্যুত হচ্ছেন।

সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই নারীদের প্রতি বৈষম্য আছে, এমনকি আজও অনেক উন্নত দেশে সমান কাজের জন্য সমান মজুরির জন্য নারীদের সংগ্রাম করতে হয়।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ভারতে, যেখানে এক পা রয়েছে পুঁজিবাদী যুগে অন্য পা রয়েছে পূর্বতন যুগে, সেখানে প্রতি পদক্ষেপেই নারীদের প্রতি বৈষম্য দেখা যাবেই। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অংশ হিসাবেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নেতাদের ও কর্মীদের নজর রাখতে হবে যাতে ইউনিয়নের নেতৃত্ব পুরুষদের গোষ্ঠী-অধিকারে পরিণত না হয়; নারীদের শিক্ষিত করে দ্রুত নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে আসতে হবে। নারীরা যদি ইউনিয়নের সংগঠনে ও

নেতৃত্বে যোগ্য স্থান না পায় তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। হাজার হাজার নারী ধর্মঘট সংগ্রামে অংশ নিয়েছে, কারাবরণ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে, পুরুষ শ্রমিক কর্মচারীর মতই অভাবের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইউনিয়নে তারা তাদের প্রাপ্য স্থান থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। নারী শ্রমিকদের দাবী নিয়ে সংগ্রাম, কারখানার শ্রমিকদের, শিক্ষক, কর্মচারী, নার্স প্রভৃতিদের সংগ্রাম ট্রেড ইউনিয়নের কাছে বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়। সমস্ত মহিলা সংগঠনকেই এই সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে হবে।

পশ্চিমবংগ

কমরেডস্, আপনাদের পক্ষ থেকে আমি আমাদের সহ-সভাপতি জ্যোতি বসু যিনি পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব করছেন, তাঁকে অভিনন্দন জানাই। পশ্চিমবংগে ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির এক মহান প্রেরণার বিষয়।

আমি পশ্চিমবংগ সি.আই.টি. ইউ-র সমস্ত নেতা ও কর্মীদের, যারা আমাদের আন্দোলনে এক নূতন সাফল্য এনে দিয়েছেন, তাদের অভিনন্দন জানাই। অভূতপূর্ব বন্যাকবলিত ১ কোটির অধিক মানুষের সংকটময় দিনগুলিতে তারা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন কেউ তা ভুলতে পারে না। তারা রাজ্য সরকারের কর্মীদের সহযোগে জনগণকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তারা ত্রাণকার্য সংগঠিত করেছেন এবং গণতন্ত্রের শত্রুদের সরকারকে অচল করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

পশ্চিমবংগ মন্ত্রিসভার কার্যপদ্ধতি, অন্যত্র জনতা ও কংগ্রেস (আই) পরিচালিত সরকার বা তামিলনাড়ু অথবা দক্ষিণ কমিউনিস্ট পরিচালিত কেরালা সরকারের অনুসৃত কার্যপ্রণালীর এক বিপরীত চিত্র প্রকাশ করে। কৃষকদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে, বেকারদের সাহায্যদানের এক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে, বর্গাদারদের পিছনে অবিচল সমর্থনে, কৃষি-শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরির ব্যবস্থা করে, বন্যাক্লিষ্ট জনগণকে সংভাবে ত্রাণের ব্যবস্থা করে—পশ্চিমবংগ মন্ত্রিপরিষদ তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যে তাঁরা বলপ্রয়োগ করবেন না, আইনসম্মত দাবী আদায়ে সংগ্রামরত শ্রমিক ও কৃষকের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার করবেন না—সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অবিচল থেকেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের দাবীর প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন।

পশ্চিমবংগই একমাত্র রাজ্য যেখানে ধর্মঘটের অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের কালে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কোন মোকদ্দমা করা হয়নি এবং পুলিশের কোন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। গণতান্ত্রিক অধিকার এত নীতিগতভাবে রক্ষার উদাহরণ অন্য কোথাও দুর্লভ।

মন্ত্রিপরিষদের সমর্থনে চটশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বাটা ও অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকেরা এক বিজয়সূচক চুক্তিতে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই এর ফলে পশ্চিমবংগে সি. আই. টি. ইউ. সংগঠন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

শ্রমিক ও জনগণের স্বার্থের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার ফলে পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার মন্ত্রিত্ব বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমাবেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এবং এই কারণেই স্বৈরাচারের শক্তিগুলি, প্রতিক্রিয়াশীল ও পুনরুত্থানভিত্তিক জনতার অংশগুলি এই মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের অভিযান শুরু করেছে। সংবাদপত্র, সংসদ কক্ষ, বিধানসভা, সবগুলিই এই সরকারের নিন্দার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির কর্তব্য এই আক্রমণের মুখোশ খুলে দিয়ে একে প্রতিহত করা এবং এই দুই রাজ্যের মন্ত্রিত্বের পিছনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমাবেশ করা।

ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য

কমরেডস্, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের সংগ্রামে আমরা কি করেছি এবং কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে।

বিগত কয়মাসে শিল্প-শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কার্যকলাপের এক উচ্চ গ্রামে পৌঁছেছে, বেশি গুরুত্বের বিষয় হল যে ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপও বেড়েছে। গত বৎসরের ২০শে নভেম্বর শিল্প সম্পর্ক বিল যেটি মোরারজী মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত শ্রমিকশ্রেণী-বিরোধী মনোভাবের দানবীয় রূপ, তার প্রতিবাদে রাজধানীতে যে অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল তা ঐক্যের জন্য তীব্র আকাংক্ষাকেই প্রতিফলিত করে। এই অভিযানে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিই যোগ দেয়। আই.এন.টি.ইউ.সি শেষ পর্যন্ত দ্বিধায় দোদুল্যমান থাকার পর শেষ মুহূর্তে অভিযানে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল এ. আই. আর. এফ-এর মত শক্তিশালী শিল্প ফেডারেশন এবং প্রতিরক্ষা শ্রমিকদের ফেডারেশন, ডাক ও তার কর্মীদের ফেডারেশন, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের

ফেডারেশন, জীবনবীমা কর্মীদের সংগঠন, বাণিজ্যিক ও ব্যাংক কর্মচারীদের সংস্থা, এ. আই. আই. ই. এ. প্রভৃতি সংস্থাগুলি।

এই ক্রমবর্ধমান ঐক্যের আগ্রহ, একদিকে এক নবজাগরণ ও অন্যদিকে জনতা সরকারের শাসনে শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর আক্রমণ বৃদ্ধির ফল।

ব্যুরো অব্ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের মজুরী সংকোচনের নীতি, ভূতলিংগম কমিটির রিপোর্ট, শিল্প সম্পর্ক বিল, শ্রমিকদের উপর বারবার গুলিবর্ষণ, এসেনশিয়েল সার্ভিসেস এ্যাক্টের আওতায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক জঘন্য শ্রমিক-বিরোধী অর্ডিন্যান্স ঘোষণা, বর্বর শাস্তিবিধানের ঘোষণা, এই সমস্ত মিলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মোকাবিলা করার ইচ্ছাকে জাগ্রত করেছে।

জনতা সরকার কর্মচারীদের উপরই বিশেষভাবে খড়্গহস্ত। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মত কর্মচারীদের উচ্চ বেতনভোগী দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করে এদের আয়কে খর্ব করে সব রকম চেষ্টায় রত থেকে তাদের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করছে। একথা সকলেরই জানা যে কিভাবে তারা এল. আই. সি. কর্মীদের বোনাস আটকে রাখার প্রচেষ্টা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে পরাজয় বরণ করে। পরিষ্কারভাবে চুক্তিপত্র সই করার পর এখন আবার তারা চুক্তি নাকচ করে দেবার নোটিশ দিয়েছে এবং এ সমস্তই করা হচ্ছে কর্মচারীদের আয় কমানোর এক পরিকল্পিত নীতি অনুসারে।

ব্যাংক কর্মচারীদের সম্পর্কেও তারা একই কৌশল গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপ ঐক্য সৃষ্টির এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কর্মচারীদের সংগঠন ও শ্রমিকদের ফেডারেশন যারা কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের সংগে যুক্ত নয়, তাদেরও তারা কাছে টেনে নিতে পেরেছে। এটা সমস্ত সংস্থা ও শিল্পের ঐ ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যের সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রশ্নটি স্পষ্ট করে তুলেছে।

যতক্ষণ না শ্রমিক আন্দোলন সরকারের নীতি নির্ধারণের উপর পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারবে ততক্ষণ তারা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করতে পারবে না। সি.আই.টি.ইউ. সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে, কর্মচারীদের সব সংগঠনকে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সকল সংস্থাকে এবং শিক্ষক-অধ্যাপকদের সকল সংস্থাকে এক সাধারণ শ্রমনীতি প্রনয়ণের জন্য এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার আহ্বান জানাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই প্রচণ্ড জাগরণ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘ পদক্ষেপ যা আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে আন্দোলিত করার ক্ষমতা রাখে; শিক্ষক-

অধ্যাপকদের সংস্থাগুলি প্রদর্শিত শক্তি আজ এত শক্তিশালী যে তারা সমস্ত শ্রমিক বিরোধী আইনকে পরাজিত করে সাধারণের স্বার্থরক্ষা করে সরকারের নীতিকে বাঞ্ছিত রূপ দেবার ক্ষমতা রাখে। আমাদের ইচ্ছা এই যে এই সংস্থাগুলি অবিলম্বে একত্র হয়ে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে দাবী ও আইন প্রণয়নের প্রশ্নে এক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে সংগঠিত হয়ে মালিকপক্ষের কাছে ঘোষণা করুন যে শ্রমিক আন্দোলন এক ও অবিভাজ্য। এই সাধারণ লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা একটাই শর্ত রাখতে চাই যে দাবীগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে অবিচল থাকতে হবে। আমরা তাই ইউনাইটেড কমিটি অব্ ট্রেড ইউনিয়ন (ইউ সি টি ইউ)কে প্রসারিত পরিধিতে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষপাতী এবং ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক 'ওয়েজ ফ্রিজ' বিরোধী কনভেনশনের মত সর্বাত্মক করতে চাই।

আমরা কি ঢিলেঢালা ধরণের একটা কনফেডারেশন গঠন করতে পারি না অথবা অন্ততঃ সকলের স্বার্থজড়িত আলোচনার জন্য এক ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের জন্য লেবার কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধরনের কিছু গঠন করতে পারি না? এখনও কি আক্রমণের মুখে বর্তমান সাময়িক ঐক্য গঠনের প্রবণতা পরিত্যাগ করবার সময় আসেনি?

সি.আই টি.ইউ. মনে করে যে এখন আমাদের ঐক্যের প্রশস্ত ও স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন এসে পড়েছে। এর থেকে আমাদের আন্দোলনের পরিপক্কতাই প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন আজ আর দৈনন্দিন সমস্যাগুলি নিয়েই আবদ্ধ থাকতে চান না, বরং তারা আয় ও মজুরীর নীতি সম্পর্কীয় বৃহত্তর সমস্যার সংগে জড়িত হয়ে পড়ছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যদি শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের স্বার্থরক্ষা করতে চায় তাহলে তাদের উপযুক্ত এক সাধারণ নীতি ঠিক করতে হবে, যেগুলি সরকারের আমদানি-রপ্তানীর নীতি, রাজস্ব নীতি ও অন্যান্যের উপর প্রযোজ্য হবে। নীতির জন্য সংগ্রাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ও দীর্ঘকালীন কার্যকলাপ ব্যতীত সার্থক করা যায় না।

নীতির জন্য সংগ্রাম

কমরেডস্, আমরা যখন ঐক্যের আহ্বান জানাই, তার জন্য সংগ্রাম করি তখন এটা একটা বড়ো সংখ্যা বাড়ানোর প্রশ্ন নয়, বরং একটা বোঝাপড়াকে ঘিরে ঐক্য গড়ার কথা বলি যার অর্থ নীতির ঐক্য। আমরা অতীতে অনেক ঘটনায় কোন কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে—আই.এন.টি.ইউ.সি, এ আই.টি.ইউ. সি-কে তীব্র সমালোচনা করেছি। তারা খোলাখুলিভাবে জরুরী অবস্থার

সমর্থন করেছেন, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণে তারা সমর্থন যোগিয়েছেন, জনগণের উপর নির্যাতন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণকে তারা আড়াল করেছেন। তারা আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য এপেক্স সংস্থায় যোগ দিয়েছেন, যে সংস্থায় সি. আই. টি. ইউ-র মত সংগঠনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে রাখা হয়েছিল। আমরা তাদের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, কিন্তু ঐ দিনগুলিতেও জরুরী অবস্থা প্রতিরোধের জন্য ঐক্যের দাবী জানিয়েছি, তাদের ভ্রান্ত শ্রেণীসমন্বয়ের নীতিকে পরিত্যাগ করতে বলেছি।

আজও যখন আমরা ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছি তখন নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেই তা করছি—সেগুলি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার সংগ্রাম, শ্রমিকদের স্বার্থ-বিরোধী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য স্বৈরতন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এটা অতীব সন্তোষের কথা যে জনতা সভ্যদের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা আমাদের প্রচেষ্টার সংগে যোগ দিয়েছেন এবং তাদের নিজের সরকারের ভুলগুলি সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন।

আমাদের ইউনিয়নগুলিকে মনে রাখতে হবে যে আমরা শুধু এক থাকার খাতিরে ঐক্য করি না, আমরা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করি; আমরা ঐক্যের নামে শ্রেণী-সহযোগীদের সংগে কোন আপোশ করি না। আমাদের গভীর ইচ্ছা এই যে এক সাধারণ লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের শ্রমিকরা এক হউন।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ

কমরেডস্, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপ ও ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য সংগ্রামের এক গূঢ় অর্থ আছে যা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিধিকে ছাড়িয়ে যায়। বুর্জোয়া-জমিদার শাসক দল অর্থনৈতিক সংকটের যে বোঝা এনে দেয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই সবচেয়ে সংগঠিত শক্তি। এদের প্রতিরোধ অন্যান্য শ্রেণীকে তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে। জনতা দলের অনুসৃত নীতির ফলে বর্তমান অবস্থায় যে অর্থনৈতিক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে, ইন্দিরা গান্ধী ও তার সাংগপাংগরা তার সুবিধা নেবার চেষ্টা করবে; এই অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিরোধ, স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্বের ফিরে আসার বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির স্বাধীন সমাবেশের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধীর বর্ধমান হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, একথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক অবস্থা

কমরেডস্, সি. আই. টি. ইউ. ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দেশের সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং কংগ্রেস (আই)র স্বৈরতন্ত্র ফিরিয়ে আনার উদ্ধত হুমকির সামনে চোখ বুঁজে থাকতে পারে না।

জনগণের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পেয়েও জনতা দল কংগ্রেস অনুসৃত একই শ্রেণীর নীতি গ্রহণের ফলে স্বৈরতন্ত্রের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। এরা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে এনেছে। এরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সভানুষ্ঠান ও সংগঠনের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার বাইরে এরা আর অগ্রসর হয়নি এবং অর্ডিন্যান্স, গুন্ডা আটক আইন ও মিসার সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকারকে আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়নি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের অসাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে এদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে, এর ফলে কংগ্রেস (আই) একাধিক ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। এই সব শক্তি কয়েকদিন আগে যারা পলায়নপর ছিল তারা নূতন সাহস খুঁজে পেয়েছে এবং সংসদে এক হুমকির মনোভাব গ্রহণ করেছে। তারা স্বৈরতন্ত্রী কাঠামো সৃষ্টিকারী ৪২তম সংবিধান সংশোধন বিলকে উচ্ছেদ করার জন্য সংবিধানকে পুনঃসংশোধনের চেষ্টাকে কার্যতঃ ব্যাহত করেছে। এর ফল হয়েছে যে জরুরী অবস্থাকালে আরোপিত সংবিধান সংশোধনীগুলি লোপ করার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা অপূর্ণ থেকে গেছে। এটা জনপ্রিয় শক্তিগুলির একটা বৃহৎ পরাজয় এবং এর জন্য দায়ী একমাত্র জনতা সরকারের আত্মসন্তুষ্টি ও নীরব নির্বুদ্ধিতা। এখন রাজ্যসভা ও দুটি রাজ্যে দৃঢ় সংখ্যাধিক্য অর্জন করে হুমকির শক্তিগুলি ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসন্তোষকে ভিত্তি করে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় যেতে চাইছে। জনতার মধ্যে পুনরুত্থানবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি—আর এস এস—ইন্দিরা গান্ধীর আরও সুবিধা করে দিচ্ছে।

একমাত্র শক্তি যারা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কত্বের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে তা হল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য, যার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার মন্ত্রিসভাগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একমাত্র এই দুটি রাজ্যেই কংগ্রেস (আই) পলায়নপর এবং এদের প্রভাব ক্ষয়ের দিকে।

অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে কংগ্রেস (আই) নেতৃত্ব তাদের

একনায়কী উচ্চাশা ও ব্যবহার কণামাত্রও ছেড়ে দেয়নি। চেন্না রেড্ডির মন্ত্রিত্বে হরিজনদের উপর আক্রমণ অব্যাহত আছে কিন্তু নকশালদের হত্যাকারী পুলিশদের রক্ষা করা হচ্ছে। নকশালদের গুলি করে হত্যার কাহিনী যাতে জনসমক্ষে না প্রকাশ হয়ে পড়ে তার জন্য ভার্গব কমিশনকে কার্যত বাতিল করা হয়েছে।

এই সেই শক্তি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।

কমরেডস্, শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে একনায়কত্বের বিপদ কেটে যায়নি; যেখানে বুর্জোয়া জমিদার-শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করে আছে সেখানে এ বিপদ থাকবেই; এবং কংগ্রেস (আই), যারা জরুরী অবস্থার দিনগুলির গুণগান করছে, তারাই এই শক্তি-গুলির প্রতিনিধিত্ব করছে।

এই বিপদকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবী করতে হবে—জরুরী অবস্থায় সংবিধানে একনায়কত্বের যে কাঠামো সংযোজিত করা হয়েছিল তার উচ্ছেদ চাই—সংবিধান থেকে নিবর্তনমূলকআটক আটক আইনের ধারাগুলি তুলে দিতে হবে--আর. এ. ডব্লিউ. সংস্থা ভেংগে দিতে হবে—রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হবে—কাজ পাওয়ার অধিকার সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—মৌলিক অধিকার-গুলিকে সংসদের কারচুপির বাইরে রাখতে হবে—সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য গণভোট নিতে হবে—ভোট প্রদানের বয়ঃসীমা কমিয়ে ১৮ বৎসর করতে হবে—আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও জনগণের অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

এই বাস্তব দাবিগুলি নিয়ে সচেতনভাবে ও ঐক্যবদ্ধভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যতই এগিয়ে যাবে এবং সংগ্রাম করবে স্বৈরাচারের শক্তিগুলি ততই প্রতিহত হবে।

শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্য রক্ষা করে একনায়কত্বের শক্তিগুলির প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার সময় সমগ্র দেশের ঐক্য রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে—যে ঐক্য প্রতিক্রিয়ার নানা অংশ দ্বারা প্রতিদিন ব্যাহত হচ্ছে।

এমন অনেকে আছেন যারা রাজ্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে আঞ্চলিক ছদ্ম দেশপ্রেমের নামে উদ্দীপ্ত করে দেশের ঐক্যকেই ব্যাহত করেন। রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবী দেশের ঐক্য ও দেশের অংশ-গুলির মধ্যে সমতাকে শক্তিশালী করে বলেই শ্রমিকশ্রেণী এই দাবীকে সমর্থন করেন। কাজেই তাদের সমস্ত রকম আঞ্চলিকতার প্রকাশকেই প্রতিরোধ করতে

হবে। অনেকে আছে অহিন্দিভাষী জনগণের উপর হিন্দি ভাষা চাপানোর দাবিতে দেশের ঐক্যকে ব্যাহত করেন। অন্যদিকে অনেকে আছেন হিন্দি বিরোধী জিগির তুলে ঘৃণার বীজ ছড়ান। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারার কেনোটির সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর কোন সম্পর্ক নেই, তারা জনগণের সমস্ত ভাষার সমতার পক্ষে, এবং তারা এক ভাষার উপর অন্যের জুলুম এবং ভাষা সম্পর্কে উন্মত্ততা, উভয়েরই বিরোধিতা করেন।

দেশের ঐক্যের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে একনায়কত্বের শক্তিগুলির প্রতিরোধের ভূমিকা চালিয়ে যেতে হবে। তারা যদি একমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামে আকণ্ঠ ডুবে থাকেন তবে তারা অচিরেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পরাজিত হবেন।

আমাদের দৈনন্দিন সংগ্রামলব্ধ ঐক্যকে গণতন্ত্রের পক্ষে ও একনায়কত্বের বিপক্ষে বৃহত্তর সংগ্রামের ভিত্তি করে তুলতে হবে। এই ঐক্য সমস্ত অংশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে প্রেরণা যোগাবে এবং সমস্ত দলকে স্বৈরতন্ত্রের শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এই সংগ্রাম জনতা সরকারের অনেক নীতির প্রতিরোধ না করে চালানো যাবে না।

একথা বলা যেতে পারে যে শ্রমিকশ্রেণী ও সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি জরুরী অবস্থায় একনায়কত্ব কায়েম নিবারণ করার পূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। একথা যেন দ্বিতীয়বার আমাদের বিরুদ্ধে বলার সুযোগ না ঘটে। আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অন্যান্য শ্রেণীকে, বিশেষ করে কৃষকদের, গণতন্ত্রের পতাকা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে অনুপ্রেরণা দিক। ভদ্র জীবিকা অর্জনে এবং সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে প্রেরণা দিক। এই ক্ষেত্রে সাফল্যের অর্থ হবে যে শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

পি. রামমূর্তি

প্রিয় কমরেডগণ,

সি আই টি ইউ-র ৪র্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রায় চার বছর পর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়েরও প্রায় এক বছর পর আজ আমরা মিলিত হয়েছি। এই বিলম্বের কারণ আপনাদের অজানা নয়। ১৯৭৫ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত আমাদের ৩য় সর্বভারতীয় সম্মেলনের অব্যবহিত পর থেকে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার ফলেই এই বিলম্ব ঘটেছে।

মজুরী সংকোচন বিরোধী সর্বভারতীয় কনভেনশনের কথা আপনাদের স্মরণ আছে। প্রস্তাবিত কনভেনশন ১৯৭৫ সনের ২৬শে জুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তার আগের দিন, অর্থাৎ ২৫শে জুন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু শত প্রতিনিধিরা দিল্লীতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐদিনই অর্থাৎ ২৬শে জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রথম প্রভাতী ঘোষণায় জানিয়েছিল যে দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে। নিকৃষ্টতম এই ব্যবস্থার আজ্ঞায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়েছে।

খুব স্বাভাবিক কারণেই জরুরী অবস্থার সময় আমাদের সংগঠনের উপরই সবচেয়ে বড় আক্রমণ নেমে এসেছিল। জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার আগে আমাদের প্রিয় সংগঠন সি আই টি ইউ শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায়সংগত দাবি দাওয়ার সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে এবং মালিকশ্রেণী ও সরকারের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সংগ্রামের পথে পরিচালিত করার জন্য সি আই টি ইউ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

প্রচণ্ড দমন-পীড়ন সত্ত্বেও প্রতিরোধ সংগ্রাম দিনের পর দিন তীব্র হচ্ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামগুলি অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সি আই টি ইউ-র বিগত সম্মেলনে উত্থাপিত আমার প্রতিবেদনেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান ঐ সংগ্রামগুলি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করেছিলাম।

শোষকশ্রেণীর জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান এই সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্য জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল।

যেহেতু শ্রমজীবী মানুষের ঐ সংগ্রামগুলির প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছিল

সি আই টি ইউ সেই কারণেই সে হয়েছিল জরুরী অবস্থার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দমন

সি আই টি ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কাউন্সিল সদস্য, রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্যসহ হাজার হাজার কর্মীকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

কেবলমাত্র সি আই টি ইউ-র সদস্য হওয়ার অপরাধে রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে বিভিন্ন কলকারখানায় ওয়ার্কস কমিটির শত শত সদস্যকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

এটা খুবই গৌরবজনক ঘটনা যে চরম আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও এই সব বীর সংগ্রামীরা মাথা নত করেননি। কয়েক মাস ধরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রায় পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে শ্রমজীবী মানুষ তথা সমস্ত গণ-তান্ত্রিক শক্তির উপর এই জঘন্যতম আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামে সামিল করা যায়নি। সভাপতির ভাষণে সঠিকভাবেই এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনের অনৈক্যই এই দুর্বলতার প্রধান কারণ এবং বস্তুত-পক্ষে এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি-র নেতৃত্ব জরুরী অবস্থাকে ফ্যাসিবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে তাকে সমর্থন করেছিল।

জরুরী অবস্থা জারীর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি-র অনুগামী শ্রমিকদের পর্যন্ত মোহভঙ্গ হতে অবশ্য বেশী সময় লাগেনি।

শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী ও চাকুরীর নিরাপত্তার উপর মালিকশ্রেণী একের পর এক আক্রমণ হানতে থাকে। কাজের বোঝা বাড়ানোর ফলে প্রায় প্রতিটি শিল্পে ছাঁটাই একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গের চটশিল্পেই প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে জরুরী অবস্থায় ছাঁটাই করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বহু সংগ্রামে অর্জিত ন্যূনতম বোনাসের অধিকার এক কলমের খোঁচায় নাকচ করে দিয়ে কুখ্যাত বোনাস আইন পাশ করা হয়। এল আই সি কর্মীদের বোনাস সম্পর্কিত স্বীকৃত চুক্তি আইন করে বাতিল করে দেওয়া হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একের পর এক জঘন্য আক্রমণ চলতে থাকা সত্ত্বেও এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব জরুরী অবস্থায় সৃষ্ট শীর্ষ সংগঠনে (Appex Body) আসন গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করেননি।

যেখানে প্রায় ৮ বছর ধরে একটি অকংগ্রেসী সরকার রাজত্ব করছিল সেই তামিলনাড়ু রাজ্যে ওরা যেসব ট্রেড ইউনিয়ন জরুরী অবস্থা ও ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী সমর্থন করেনি তাদের বাদ দিয়ে একটি রাজ্যভিত্তিক এ্যাপেক্স বডি গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন।

বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের যেসব কমরেডরা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা আত্মগোপন করে শ্রমিকদের সংগে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সমস্ত অধিকার অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও অল্প কয়েক মাস পরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। ঐ সব গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

বোনাসের দাবিতে বাটা শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, ঐ একই দাবিতে হায়দ্রাবাদের আই ডি পি এল সংস্থার শ্রমিকদের লড়াই, উচ্চহারে বোনাসের দাবিতে বোম্বাই-এর সেঞ্চুরি রেয়নের শ্রমিকদের ধর্মঘট, ভারতীয় টেলিফোন শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘট, কাজের বোঝা বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোটায় জে কে ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিকদের লড়াই, বোনাস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর রাজ্যভিত্তিক ধর্মঘট, জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে কেরালা ও বম্বে বন্ধ, বম্বের সিট (CEAT) কারখানা, কানপুরের জে কে জুট মিল, গাজিয়াবাদ ও ফরিদাবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসমূহের শ্রমিকদের ধর্মঘট ইত্যাদি। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে জরুরী অবস্থার সময় প্রায় দুই হাজার শ্রমিক-ধর্মঘটের ঘটনা ঘটেছে।

সি আই টি ইউ, এইচ এম পি, বি এম এস-এর (যে অংশ জরুরী অবস্থা এবং সরকারকে সমর্থন করেনি) নেতারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। এই ইস্তাহারে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে যে পথ খোলা আছে সেই পথে বোনাস অধিকারের উপর জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়েছিল। এই যুক্ত ইস্তাহার লাখে লাখে ছেপে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গোপনে প্রচার করা হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণী এই যুক্ত ইস্তাহারের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেরেছিলেন যে কারণে এটি শ্রমিকশ্রেণীর মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম

হয়েছিল। বোনাস অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন কোন শিল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লড়াই গড়ে উঠেছিল। বোম্বাই-এর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি সুতাকলের শ্রমিকদের একমাত্র ইউনিয়নটি আই এন টি ইউ সি র দ্বারা পরিচালিত হতো। সেখানকার শ্রমিকরা আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বের পরামর্শ উপেক্ষা করে পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত বোনাসের সমহারে বোনাস দেওয়ার দাবিতে ধর্মঘটে নেমে পড়েন। বহু ধর্মঘটী শ্রমিক গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও সেই সুতাকলের শ্রমিকরা অসম সাহসিকতার সঙ্গে ধর্মঘট চালিয়ে যান এবং মালিককে দাবি মানতে বাধ্য করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অধীন বাঙ্গালোরের আই টি আই কারখানায় শ্রমিকরা যেইমাত্র খবর পান যে পূর্ব বছরে প্রদত্ত বোনাস সেই বছর দেওয়া হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তারা যন্ত্র নামিয়ে কাজ বন্ধ করে অবস্থান শুরু করেন। এক বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে—শ্রমিকে-পুলিশে প্রচন্ড সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রচন্ড পুলিশী হামলায় পর্যুদস্ত শ্রমিকরা দেওয়াল টপকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়।

শ্রমিকদের কোয়ার্টারে গিয়েও পুলিশ হানা দেয়। সেখানে বসবাসকারী শ্রমিক ও তাদের পরিজনদের উপর ডান্ডাবাজি করে।

বাঙ্গালোর আই টি আই কারখানার শ্রমিকদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নেতৃত্ব চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের নিকট সি আই টি ইউ এই মর্মে আবেদন জানিয়েছিল যে জরুরী অবস্থাকে তারা (এ আই টি ইউ সি) রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করলেও যেন তারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রচন্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সি আই টি ইউ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব এই আবেদনে সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল শুধু নয়, ওদের নেতা এস এ ডাঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে বোনাস অধিকার কেড়ে নেওয়ার বা মজুরী সংকোচন নীতি চাপিয়ে দেওয়ার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর যে লোকসান হয়েছে, জরুরী অবস্থা জারি হওয়ায় দেশ ও জনগণ তার অনেক অনেকগুণ লাভবান হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সবটুকু কেড়ে নেওয়ার ঘটনার কোন গুরুত্বই শ্রীযুক্ত এস এ ডাঙ্গে বা এ আই টি ইউ সি-র অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে ছিল না।

সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে স্বর্ণ সিং কমিটির রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয়, যা আইনে রূপায়িত হলে জরুরী অবস্থা একটি আইনসিদ্ধ চিরন্তন ব্যবস্থায় পরিগণিত হবে, তখন দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি এর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। বহু রাজ্যে সি আই টি ইউ প্রস্তাবিত সংবিধান

সংশোধনের আসল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গোপন ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং সেগুলি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রচার করে। যেখানে যখন যে সুযোগ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে প্রস্তাবিত কুখ্যাত সংবিধান সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সভা-সমাবেশ সংগঠিত করে।

ইন্দিরা গান্ধী যখন হঠাৎ নির্বাচনের ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক জুয়া খেলায় নামল তখন তার সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে অপ্রস্তুত রেখে সে সহজেই নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে এবং তার মধ্য দিয়ে ইমারজেন্সির মত চরম স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থাকে বিশ্ববাসীর চক্ষে গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিভাত করে তুলতে পারবে। কিন্তু দেশের শ্রমিকশ্রেণী তাঁর এই চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক খেলাকে ব্যর্থ করে দিতে এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে দেশের শ্রমিক অধ্যুষিত সব ক'টি সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস ও তার সহযোগী শক্তিগুলি চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি এবং এইচ এম এস-এর একাংশের অজস্র ধারায় প্রশংসা বর্ষণও শ্রীমতী গান্ধীর শাসনকে রক্ষা করতে পারেনি।

ইমারজেন্সি প্রত্যাহৃত হওয়ার পরবর্তীকাল

নির্বাচনের ফলাফল এবং কেন্দ্রে জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠা শ্রমিকশ্রেণীর মনে প্রচন্ড আশা জাগায়। এর কারণ জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার যার মধ্য দিয়ে জনতা পার্টি দেশের মানুষের কাছে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল যে তারা সরকার গঠন করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পুনরুজ্জীবিত করবে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে আরোপিত স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থাসমূহকে ভেঙ্গে দেবে, সর্বোপরি শ্রমিক স্বার্থানুকূল নীতি অনুসরণ করবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে জরুরী অবস্থার সময় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরোপিত সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হবে। জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে বোনাসকে বকেয়া মজুরী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। ঐ ইস্তাহারে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরীকেই ন্যূনতম মজুরী বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল যে জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ মহার্ঘভাতা প্রদানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জনতা সরকার হৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে

পুনরুজ্জীবিত করেছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। রেলমন্ত্রী প্রথম সুযোগেই ১৯৭৪ সনের রেল ধর্মঘটের সময় রেল কর্মীদের বিরুদ্ধে আরোপিত সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন। যোগাযোগমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজও তাঁর আওতাধীন সরকারী সংস্থাসমূহে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেন।

স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থাগুলিতেও জরুরী অবস্থার সময় আরোপিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রত্যাহারের জন্য ধর্মঘট ও আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথম কয়েক মাস জনতা সরকার এইসব আন্দোলনগুলির প্রতি কিছুটা সহানুভূতিসূচক মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে এবং শ্রমিকদের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী প্রভাবকে শ্রমিকদের পক্ষে লাগায়।

কিন্তু শীঘ্রই জনতা সরকারের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ প্রকাশ করতে থাকে যে এই সরকার পূর্বেকার সরকারের থেকে কোন দিক থেকেই আলাদা নয়। সভাপতি কমরেড বি টি আর-এর ভাষণে এই দিকগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাজেই আমি সেদিকে না গিয়ে আমার প্রতিবেদনে এই সময়কালের মধ্যে আমরা যে ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং যে উদ্যোগ আরও জোর দিয়ে গড়ে তুলতে হবে তার বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই।

আয়, মজুরী এবং মূল্যনীতি সম্পর্কে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে বহু মন্ত্রী এবং অফিসার আগের আমলের মতই বুলি আওড়াতে শুরু করেছে এবং সংগঠিত শিল্প শ্রমিক এবং অসংগঠিত শ্রমিক কৃষিমজুরদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শেষোক্তদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছে।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন

এই পরিস্থিতিতে একটি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশন সংগঠিত করার জন্য আমরা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানাই। ১৯৭৭ সনের সেপ্টেম্বরে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সিকে এই কনভেনশনে ডাকা হয়নি এবং তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা সম্ভবও ছিল না। ঐ সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতারা জরুরী অবস্থার প্রতি যে দ্বিধাহীন সমর্থন জুগিয়েছিল এবং নির্বাচনে

পরাজিত হয়েও, নির্বাচনে ওঁদের অনুসৃত নীতি ওঁদের অনুগামীদের দ্বারা ধিক্কৃত হওয়া সত্ত্বেও সে সম্পর্কে অনুতাপ প্রকাশ না করায় শ্রমিকশ্রেণীর এক বৃহদংশের কাছে এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিতে ওঁরা সন্দেহভাজন ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ঐ সময় অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্মেলনে এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সিকে ডাকতে সম্মত হয়নি।

যাই হোক, আমরা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে সেই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে দিতে সম্মত করাতে পেরেছিলাম যেগুলি কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাভুক্ত নয়, অথচ যেগুলিতে অন্যান্যদের সঙ্গে এ আই টি ইউ সি-র প্রতি অনুগত নেতারও কাজ করেন। যেমন সারা ভারত প্রতিরক্ষা কর্মীদের ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের আওতাধীনে নয় দলমত নির্বিশেষে এমন সব পৃথক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে দিতে সম্মত করাতে পেরেছিলাম।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে দিল্লী শহরের সবচেয়ে বড় হল যেটা সেই বিজ্ঞান ভবনের প্রধান হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তিন হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সামনে দুটি প্রধান বিষয়ের উপর সম্মেলনের আলোচ্যসূচীকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। একটি ছিল ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে গ্রথিত স্বৈরাচারী ব্যবস্থা-সমূহ ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয় সংক্রান্ত; আর অপরটি ছিল মজুরী, আয় ও মূল্যনীতি সংক্রান্ত। সম্মেলন থেকে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার দাবি উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করার দাবি উঠেছিল যাতে মৌলিক অধিকারগুলি অলঙ্ঘ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং একমাত্র বহিরাক্রমণ ছাড়া জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন সুযোগ না থাকে।

মজুরি, আয় ও মূল্যনীতির প্রশ্নে, সম্মেলন জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে লিপিবদ্ধ বিবৃতিকে সমর্থন করেছিল এবং ঐ নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি কার্যকরী করার দাবি জানিয়েছিল। সম্মেলন সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল যে দেশের আয়-বৈষম্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রুজি বৈষম্যকেই সূচিত করে। একদিকে রয়েছে—একচেটিয়া এবং বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী, সামন্ত শ্রেণী, ফাটকাবাজ প্রভৃতি মুনাফা শিকারীরা—অপরদিকে রয়েছে শিল্প শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষিমজুর, কৃষিজীবী এবং জনগণের অন্যান্য শ্রমজীবী

অংশ। কৃষিমজুরেরা নামমাত্র মজুরি পায় এই অজুহাত দেখিয়ে শিল্প শ্রমিক এবং কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে নস্যাৎ করার নীতিকে সম্মেলন থেকে ধিক্কার জানানো হয়। সম্মেলন দেখিয়ে দেয় যে কৃষিমজুরদের এই দুর্দশার জন্য শ্রমিকশ্রেণী কোন দিক থেকেই দায়ী নয়। ভূমিপ্রভুরা তাদের (কৃষিমজুরদের) রক্ত শুষে নেয় বলেই তাদের এই দুর্দশা। বস্তুতঃ এইটাই আসল ঘটনা যে সংগঠিত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম কৃষিমজুর-সহ অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়ায় দেশের বহু অংশে কৃষিমজুররা তাদের সংগ্রামের জোরে মজুরি বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে আরও দেখানো হয়েছে যে দেশের আয়-বৈষম্য দূর করা তো যাবেই না বরং তা আরও বেড়ে যাবে যতক্ষণ না দেশী-বিদেশী একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং সামন্তপ্রভুদের সম্পত্তির অধিকারের উপর জোর আঘাত হানা হচ্ছে।

সম্মেলন শেষে এক প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে সম্মেলনের প্রস্তাবটি দিয়ে জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে লিপিবদ্ধ আয়, মজুরি ও মূল্যনীতিকে কি করে বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে সরকার যাতে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করে সেইজন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সম্মেলন-পরবর্তীকালে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশের বহু প্রান্তে যুক্তভাবে সভা-সমাবেশ সংগঠিত করা হয়। সি আই টি ইউ-র রাজ্য কমিটিগুলি সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবটি বহু ভাষায় ছেপে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে।

এতদসত্ত্বেও সরকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তাদের সঙ্গে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। এর পরিবর্তে সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস অফিসার শ্রী ভূথালিঙ্গমের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এই ব্যক্তিটি একটি বহুজাতিক সংস্থা লিভার ব্রাদার্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত একাধিক সংস্থার ডিরেকটর হিসেবে যোগদান করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের অধিকাংশই ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটগুলি থেকে নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিত্বের নামগন্ধ নেই। এই কমিটির গঠন এবং এর বিবেচ্য বিষয়গুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। অন্যদিকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে কৃষি-মজুরদের অবস্থার

উন্নতির নামে সরকার মজুরী সংকোচন নীতি অনুসরণের পথে এগিয়ে চলেছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই সরকারের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ভুথালিংগম কমিটি বয়কট করার সিদ্ধান্ত হয়। এটা কোন কমিটি নয়, একটি 'স্টাডি প্যানেল' মাত্র ইত্যাদি বলেও সরকার ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই কমিটির সংগে সহযোগিতা করতে সম্মত করাতে ব্যর্থ হয়।

ভুথালিংগম কমিটির প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আশংকা সত্য বলে প্রমাণিত করে। কমরেড বি টি আর-এর ভাষণে ভুথালিংগম কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আর্থিক দিকটি দেখাশোনা করার জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরের সংগে যুক্ত কতিপয় অফিসারকে নিয়ে যে ব্যুরো অব পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস (বি. পি. ই) গঠিত হয়, কালক্রমে তা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে মজুরি বৃদ্ধির আলোচনা অবাধ না হয়ে তার পাহারাদার হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত এন্টারপ্রাইজ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিকট একটি সার্কুলার পাঠিয়ে বলে যে ভুথালিংগম কমিটির রিপোর্ট পেশ না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার মজুরি, আয় ও মূল্যনীতি সম্পর্কে কোন নীতি ঘোষণা না করা পর্যন্ত যেন কোন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে মজুরী সংক্রান্ত আলোচনা না চালানো হয়। জরুরী অবস্থা চলাকালীন অবস্থাতেও যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় সেইসব সংস্থার কর্তৃপক্ষও B. P.E-র নির্দেশ অনুসারে নতুন মজুরি চুক্তির আলোচনা শুরু করতে আপত্তি জানায়। এর প্রকৃত অর্থ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কার্যতঃ মজুরি সংকোচন নীতি চালু করা। এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই দুরভিসন্ধি সফল হলে ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থাগুলিতেও সরকারী নীতির অনুসরণে সংকোচন নীতি কার্যকরী করা হবে। এও বোঝা যায় যে একটি-দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ধর্মঘট করে সরকারের উক্ত শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী নীতিকে পরাস্ত করা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের সংগ্রাম

এই রকম একটি উদ্যোগ সফল করার জন্য আমরা হায়দ্রাবাদের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং

তাঁদের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে একটি সভায় মিলিত হই। সেখানে এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়। সেখান থেকে যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি দেশের সব কটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে হায়দ্রাবাদে একটি কেন্দ্রীয় কনভেনশনে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানায়। ১৯৭৭ সনের ২৩-২৪শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত ঐ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে সহায়কশক্তি হিসেবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আবেদন জানানো হয়।

এই সময়ে বাঙ্গালোরের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করতে বাধ্য করার জন্য আন্দোলনের একটি কর্মসূচীও ঠিক কর হয়। সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক বাঙ্গালোর গিয়ে এ্যাকশন কমিটি এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁদের হায়দ্রাবাদ কনভেনশনে যোগদান করার জন্য আবেদন জানান। আই এন টি ইউ সি-কেও যাতে এই কনভেনশনে যোগদান করতে দেওয়া হয় তার জন্য বি এম এস এবং এইচ এম পি-র নেতৃত্বকে সম্মত করাতে আমাদের গলদঘর্ম প্রয়াস চালাতে হয়।

হায়দ্রাবাদে কনভেনশনটি সফল হলেও, এর প্রতিনিধিত্ব যতটা ব্যাপক এবং কার্যকরী হতে পারতো সময়াভাবে তা হয়নি। কারণ যে সময়ে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংগঠন যোগদানে সম্মত হলো তখন তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কনভেনশনে যোগদান করার জন্য খবরাখবর দেওয়ার সময় ছিল না।

২০. ১. ৭৮ তারিখটি দেশের সর্বত্র সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মজুরি সংকোচন নীতি-বিরোধী দিবস হিসেবে পালনের জন্য কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রস্তুতির ব্যাপকতা অনুসারে ঐক্যবদ্ধভাবে মিছিল সমাবেশ এবং যেখানে সম্ভব বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় যুক্ত সমাবেশ সংগঠিত হয়। ঐদিন বাঙ্গালোরের সবকটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। সত্তর হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়। BEML-এর কোলার স্বর্ণখনিতেও ৬০০০ শ্রমিকের পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। হায়দ্রাবাদেও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় প্রায় পনের হাজার শ্রমিক ঐদিন ধর্মঘট করে। ঐ দিনটি এমন একটি দিন ছিল যেদিন প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর কেবিনেটের অধিকাংশ সদস্য এবং জনতা পার্টির বহু নেতা বাঙ্গালোরে ১৯৭৮

সালের ফেব্রুয়ারীতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোট বাধার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য পদার্পণ করেছিলেন।

সমাগত নেতৃবৃন্দের প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের এরূপ অভূতপূর্ব 'বিপুল সম্বর্ধনা' সরকারকে ভাবনায় ফেলেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই BPE রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যাতে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মজুরি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে সেখানে অবিলম্বে নতুন হারে মজুরি নির্ধারণের জন্য আলোচনা শুরু করা হয়। আর ১৯৭৮ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকেই আলোচনা শুরু হয়ে যায়। শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে বিরত করার জন্যই এই রকম ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। তাদের ২০শে জানুয়ারীর আন্দোলন সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে, শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরণের একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছিল। আলোচনাকে দীর্ঘসূত্রী করা হতে থাকল যার ফলে শ্রমিকদের মোহভঙ্গ হতে সময় লাগেনি। কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে মূল্যসূচীর পয়েন্ট পিছু মহার্ঘভাতার প্রচলিত হার ১.৩০ টাকা থেকে বাড়ানো হবে না এবং মূল বেতনের মাত্র পাঁচ টাকা বাড়াবার প্রস্তাব দেন। এমন কি যে সব সংস্থায় মহার্ঘভাতার হার বেশী সেখানেও কর্তৃপক্ষ দাবি জানাতে থাকেন যে মহার্ঘ-ভাতার হার কমিয়ে ১.৩০ টাকা করতে শ্রমিকরা সম্মত না হলে অন্যান্য বিষয়ে, এমনকি যেসব বিষয়ে অর্থ জড়িত নেই, সেইসব বিষয়ে আলোচনা শুরু করা হবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষ B P E-এর নির্দেশানুসারেই চলছিলেন।

এই অ চরণে যৌথ দরকষাকষির বিষয়কে একটা পরিহাসের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। কারণ যৌথ দরকষাকষির সুযোগ না থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় সি আই টি ইউ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে। হায়দ্রাবাদ কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে সরকার অনমনীয় মনোভাব দেখালে যেন তারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে একটি ব্যাপকাকারে কেন্দ্রীয় কনভেনশন সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতদনুসারে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি যুক্তভাবে ১৯৭৮ সনের ১৫ই মে দিল্লীতে আর একটি কেন্দ্রীয় কনভেনশন সংগঠিত করে। এই কনভেনশন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ নেয়। কারণ এতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের সমস্ত ইউনিয়ন, সে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিগুলির সঙ্গে

যুক্ত হোক বা না হোক, অংশ নেয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ইউনিয়ন-সমূহের ফেডারেশনগুলিও এই কনভেনশনে যোগ দেয়। কনভেনশনে একটিই মাত্র প্রস্তাব পাশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবে ব্যুরো অব পাবলিক সেক্টর এন্টার-প্রাইজের ভূমিকাকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার অস্বীকার করার অপপ্রয়াস হিসেবে ধিক্কার জানানো হয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকদের অধিকার দাবি করা হয়। প্রস্তাবের এই দাবি কার্যকরী করার জন্য ১৯৭৮ সনের ১০ই জুন সারা ভারত দিবস হিসেবে পালনের এবং ২৮শে জুন দেশের সব কাট রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়।

এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গড়ে তোলা হতে থাকে। সরকার প্রথমে একে আমল দেননি। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এই বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন যে এই ধর্মঘট ভূথালিংগম কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে যে কমিটির রিপোর্ট ইতিপূর্বেই প্রচারিত হয়েছে এবং যে সম্পর্কে সরকার তখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই নেয় নি। ট্রেড ইউনিয়নগুলি কার্যকরীভাবে এই অপপ্রচারের মোকাবিলা করে। যখন সরকারী সূত্রে জানা গেল যে ২৮শে জুনের প্রস্তাবিত ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল হতে চলেছে এবং অন্ততঃ ১৫ লক্ষ শ্রমিক সামিল হতে চলেছে, একমাত্র তখনই সরকার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে আলোচনা করতে সম্মত হন। ২৪শে জুন রাত্রে এবং পরের দিন সকালে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী তাড়াহুড়ি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংগে সরকারের আলোচনার জন্য ২৬শে জুন একটি বৈঠক ডাকেন।

সরকারের পক্ষে শ্রম, শিল্প, পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন এবং অর্থ দপ্তরের মন্ত্রীরা সভায় উপস্থিত থাকেন। অর্থমন্ত্রী বলেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চূড়ান্ত নিয়োগকর্তা হিসেবে এই আলোচনায় সরকারের অবশ্যই কিছু বক্তব্য আছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষ করণীয় ঠিক করার জন্য পরামর্শমূলক কিছু নীতি নির্ধারণ সরকার অবশ্যই করতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে সরকারী দপ্তরের এই ধরণের পরামর্শ যা সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা সরকারী নির্দেশ বলে মনে করেন, সেই পরামর্শ যদি একতরফাভাবে দেওয়া হয়, তবে তা যৌথ দরকষাকষির প্রক্রিয়াকে একটা পরিহাসের বস্তুতে পরিণত করে। পরিশেষে সভায় ঠিক হয় যে পরামর্শমূলক নীতিগুলি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করে ঠিক করা হবে এবং আলোচনার

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সভায় এও ঠিক হয় যে এই পরামর্শমূলক নীতিগুলি নমনীয় হওয়া উচিত এবং সেগুলি সরকারী নির্দেশের বিকল্প হিসেবে বিবেচ্য হবে না। এও স্বীকৃত হয় যে এল আই সি কর্মীদের বোনাস যা কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে তা নিয়েও আলোচনা হবে। ঐ সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্তগুলি সরকারী বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচারিতও হয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরামর্শমূলক নীতি নির্ধারণের জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ২৮শে জুনের প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য কর্মীদের পরামর্শ দেয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার ঐ চুক্তি কার্যকরী করায় গড়িমসি করতে থাকে। প্রায় দুইমাস পরেও আলোচনার কোন ব্যবস্থাই করা হয় না।

এর পর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে যুক্তভাবে সরকারের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়ে বলা হয় সরকার অবিলম্বে প্রতিশ্রুতিমত পরামর্শ সংস্থা (Consultative machinery) গঠন না করলে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নামার পরামর্শ দিতে তারা বাধ্য হবেন। এই চিঠি পাওয়ার পরেই কেবল সরকার কন্সালটেটিভ কমিটি গঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আর একটি সভা ডাকেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি করেন যে প্রস্তাবিত কমিটিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং সরকারের পক্ষে কে থাকবে সেটা সরকারই ঠিক করবেন। তবে, সরকারের পক্ষে অর্থ দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকা চাই। সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ঐ কমিটির কোন সভাই ডাকা হয়নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য সরকারের নিন্দা করে ২২শে ফেব্রুয়ারী সংসদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। এর পরই কেবল BPE তড়িঘড়ি ২৪শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ৫ই মার্চ '৭৯ তারিখ কনসালটেটিভ কমিটির সভা ডাকার প্রস্তাব করেন।

এদিকে কতকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বদ্ধপরিকর দেখতে পেয়ে সেই সব সংস্থার কর্তৃপক্ষ নতুন পরামর্শমূলক নীতি নির্ধারণের পর নতুন মজুরি-হার নির্ধারণের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে প্রচলিত মজুরির শতকরা দশভাগ টাকা অন্তর্বর্তী ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করতে বাধ্য হন। এই অন্তর্বর্তী মীমাংসাকে চূড়ান্ত মীমাংসায় পরিণত করার জন্যই কর্তৃপক্ষের উপর BPE এখন চাপ দিচ্ছে।

এর থেকে পরিষ্কার যে এই বিষয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য

সরকারের কোন গরজ নেই। লম্বা-চওড়া কথাবার্তা সত্ত্বেও সরকারের অর্থ-নৈতিক এবং বাণিজ্যিক নীতিগুলি নতুন করে মুদ্রাস্ফীতির চক্র সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সুনিশ্চিত করতে অস্বীকার করে সরকার কার্যত মজুরি সংকোচনই করছে শুধু নয়, প্রতিনিয়ত প্রকৃত মজুরির হ্রাস ঘটাচ্ছে। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরেই এই সরকারী নীতিকে পরাস্ত করতে হবে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সি আই টি ইউ-কে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্রম সম্পর্ক বিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি তুলেছিলেন যে নতুন শ্রম সম্পর্ক আইন তৈরী করতে হবে এবং প্রচলিত শ্রম সম্পর্ক আইনকে পুরোপুরি সংশোধন করতে হবে। সরকার শ্রম সম্পর্ক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিদেরও নেওয়া হয়। অধিকাংশ বিষয়েই ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা ঐক্যমত পোষণ করেন। ইউনিয়নের স্বীকৃতি এবং যৌথ দরকষা-কষির প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরাই গোপন ব্যালট দাবি করেন। এই বিষয়ে আই এন টি ইউ সি-র প্রতিনিধিরা যদিও গোড়ায় একমত হন, কিন্তু পরে যুক্ত প্রস্তাবের বিষয়গুলি উল্লেখ করে কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট যুক্তভাবে একটি চিঠি দিতে অসম্মত হন।

শ্রমিকদের মনে আশা জাগে যে সরকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রস্তাব মেনে নেবেন। আই এন টি ইউ সি প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে 'গোপন ব্যালট' সম্পর্কে তাদের আপত্তি তুলে নেয়।

এত সব সত্ত্বেও সরকার গত আগস্ট মাসে সংসদের শারদ অধিবেশনে এমন একটি শ্রম সম্পর্ক বিল উত্থাপন করেন যা দেখে গোটা শ্রমিকশ্রেণী হতবাক হয়ে যায়। লোকসভা বিলটি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করেছে এবং রাজ্যসভাকে ঐ কমিটিতে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার সুপারিশ করেছে। সময়ের অভাবে বিলটি রাজ্যসভায় উত্থাপন করা হয়নি।

কুখ্যাত ঐ বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সি আই টি ইউ প্রাপ্ত সময়ের সুযোগটুকুর পূর্ণ ব্যবহার করে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এই বিলের বিরোধিতা করেছে। এই

বিল প্রত্যাহারের দাবি করে বহু রাজ্যে যুক্ত কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে পরামর্শ করে ঠিক হয় যে ১৯শে নভেম্বর '৭৮ দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় কনভেনশন করা হবে এবং পরের দিন, অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর সমগ্র দেশ থেকে আগত শ্রমিকদের নিয়ে সংসদাভিমুখে একটি মিছিল সংগঠিত হবে। প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্ততা সত্ত্বেও আই এন টি ইউ সি শেষ পর্যন্ত ঐ কর্মসূচীগুলিতে অংশ নিতে সম্মত হয়। একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯শে নভেম্বর প্রস্তাবিত কনভেনশনটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এইটিই সর্ববৃহৎ কনভেনশন। নতুন দিল্লীর এন ডি এম সি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে ১০,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। কনভেনশন কুখ্যাত শ্রম সম্পর্ক বিল পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। সংগে সংগে এও দাবি করে যে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে আলোচনার ভিত্তিতে একটি নতুন আইন প্রনয়ণ করতে হবে। ২০শে নভেম্বরের মিছিলে সমগ্র দেশ থেকে আগত ২ লক্ষেরও বেশী শ্রমিক সামিল হয়েছিল। রাজ্যসভার সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপরই এই ঐতিহাসিক জমায়েতের প্রভাব পড়ে। যেহেতু সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যেসব ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করেন তারা সকলে একযোগে এই বিলের প্রত্যাহার দাবি করেছে, ফলে সরকার দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে পড়ে। এই কারণে, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনের সময় রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপন করতে সরকার ভরসা পায়নি, পাছে বিলটি নাকচ হয়ে যায় এই ভয়ে।

সংগ্রামের নতুন জোয়ার

অন্যান্য আরও বহু বিষয় নিয়ে যৌথ কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। ভূতালিংগম কমিটির রিপোর্টটির বিরুদ্ধে আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে যুক্ত কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে।

গত দু-বছরের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে মজুরি, বোনাস ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে এবং ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পশ্চিমবংগের ২½ লক্ষ জুট মিল শ্রমিকের দেড় মাসব্যাপী ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট। শক্তিশালী আন্দোলনের চাপে মালিকরা শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-পিছু ন্যূনতম ৬৫·২৭ টাকা মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। ধর্মঘটের হুমকির সামনে পশ্চিমবংগের ইঞ্জিনিয়ারিং

শ্রমিকরাও মাথা পিছু ৬৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তামিলনাড়ু, কেরালা, রাজস্থান এবং অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ শক্তিশালী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে রাজস্থানের এ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যান্টে সি আই টি ইউ-র উদ্যোগে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সংগে মিলিতভাবে যে ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের বিগত সম্মেলনের পূর্ববর্তী সময়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা গত দুবছরে আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। শুধু শিল্প শ্রমিকরাই নয়, মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সংগঠিত করেছে। আলোচ্য সময়-কালের মধ্যে যে সংগ্রামগুলি সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৭৩ দিন ব্যাপী ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের সমর্থনে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিলে যে মহারাষ্ট্র বন্ধের ডাক দেয় তা সার্বিক সাফল্য লাভ করে। সমস্ত শিল্পসংস্থায় পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।

(২) বিহারের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে নেমে-ছিল।

(৩) বিহার, অন্ধ্র, কেরালা এবং ইউ পি-র বিদ্যুৎ কর্মীরাও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে নেমেছিল।

অত্যাবশ্যক কৃত্যক আইন প্রয়োগ করে এই ধর্মঘটগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রচন্ড দমনপীড়ন সত্ত্বেও এই ধর্মঘটগুলি ভাংগা যায়নি।

(৪) সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে গঠিত যুক্ত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে রাজস্থানের ক্ষেত্রী তামা খনির দুই মাস ব্যাপী ধর্মঘট একটি বিশেষ ঘটনা।

(৫) কয়লা খনির ছয় লক্ষ শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এবং বি পি ই-র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ৫.২.৭৯ তারিখ সাফল্যের সংগে একদিনের প্রতীক ধর্ম্মঘট পালন করে।

(৬) ব্যাংক কর্মচারীরা সারা দেশব্যাপী ২ দিনের যে ধর্মঘট সাফল্যের সংগে পালন করে যাতে উভয় ফেডারেশনই যুক্তভাবে সামিল হয়েছিল, তার ফলে সরকার হস্তক্ষেপ করতে এবং মীমাংসা করতে বাধ্য হয়।

(৭) নতুন মজুরি চুক্তির দাবিতে এল আই সি কর্মীরা সমস্ত ইউনিয়নের যুক্ত উদ্যোগে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে।

(৮) বোম্বাই এর দেড় লক্ষ সুতাকল শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এক-দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। স্বীকৃত ইউনিয়ন বলে কথিত একমাত্র আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন ছাড়া আর সব কয়টি ইউনিয়ন যুক্তভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল।

(৯) বামার লরি ইউনিট, যেটি এখন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সেখানকার শ্রমিকরা গত দুমাস ধরে ধর্মঘট করে চলেছে। একটা চুক্তিতেও উপনীত হওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বি পি ই বাধা দিয়ে বলে যে মহার্ঘভাতার পয়েন্ট পিছু হার ১·৩০ টাকায় নামিয়ে আনতে হবে। বি পি ই-র একগুঁয়ে মনোভাবের ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

(১০) দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা, অর্থাৎ দিল্লী, গাজিয়াবাদ, মোদীনগর, সোনপাত এবং ফরিদাবাদের শ্রমিকরা ঐ অঞ্চলের পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে ৭.৫.৭৭ তারিখ একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে।

(১১) সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় অফিসাররাও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছে এবং নানা কায়দায় বিক্ষোভ প্রদর্শন, মায় ধর্মঘট পর্যন্ত করেছে।

কমরেডগণ, ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা এক কঠিন কাজ এবং পথে বহু বাধা।

প্রথমতঃ, গোড়ার দিকে অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি জরুরী অবস্থায় আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি-র ঘৃণ্য ভূমিকার জন্য এবং পরবর্তীকালে খোলাখুলিভাবে ঐ ভূমিকার জন্য অনুতাপ প্রকাশ না করার জন্য তাদের সংগে মিলিত আন্দোলন নিয়ে কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, এই বাধা অতিক্রম করার পর এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্ব আরও অসুবিধা সৃষ্টি করছে।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আলোচনা চলার সময় এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব প্রায়ই একতরফাভাবে কর্মসূচী ঘোষণা করতে ছুটে যায়। স্বভাবতই অন্যরা এ আই টি ইউ সি-র পিছু পিছু ছুটতে আপত্তি জানায়।

তৃতীয়তঃ, এ আই টি ইউ সি-র নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বীকৃত রীতি উপেক্ষা করে নিজেদের রাজনৈতিক মতামতকে প্রাধান্য দিতে চায়। বারবার ওদের এই আচরণ সম্পর্কে আপত্তি জানাতে হয়েছে।

চতুর্থতঃ, আই এন টি ইউ সি পুরোপুরিভাবেই সি আই টি ইউ-র সংগে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামার বিরোধী। কিন্তু নীচের তলার অনুগামী-দের চাপ নেতৃত্বকে এই মনোভাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এখনও আই এন টি ইউ সি-র একটা শক্তিশালী অংশ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিরোধী। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে শ্রম সম্পর্ক বিল বিরোধী কনভেনশনে

যোগদান করার ব্যাপারে আই এন টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ততা দূর হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। এর আগে রাজ্যে রাজ্যে যে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয় সেখানে আই এন টি ইউ সি-র অনুগামীরা আই এন টি ইউ সি পরিচালিত ইউনিয়নগুলি, এমন কি ওদের বিভিন্ন রাজ্য কমিটি সি আই টি ইউ এবং অন্যান্যদের সংগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। এর ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর যে চাপ পড়ে তার ফলেই শেষ মুহূর্তে ওরা ১৯শে নভেম্বরের কনভেনশনে যোগদান করতে সম্মত হয়।

এও উল্লেখ করা দরকার যে, এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব অন্যান্য রাজ্যে আন্দোলনের ডাক দিতে খুবই আগ্রহী কিন্তু একই বিষয়ে তারা সমান অনাগ্রহ প্রকাশ করেন কেরালার আন্দোলনের ক্ষেত্রে। শুধু অনাগ্রহ নয়, সরাসরি বিরোধিতা করেন। ঐ রাজ্যের বিদ্যুৎকর্মী, রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই জিনিষ ঘটেছে। বিহার, ইউ পি প্রভৃতি রাজ্যের বিদ্যুৎকর্মী বা সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যক কৃত্যক অর্জন ব্যবহারের বিরোধিতা করতে এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব এগিয়ে এলেও ঐ একই কায়দায় কেরালার বিদ্যুৎকর্মী বা সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন দমন করার জন্য সরকারী উদ্যোগের নিন্দা করতে তারা প্রস্তুত নন। কেরালার শত শত ধর্মঘটী বিদ্যুৎকর্মীকে গ্রেপ্তারের ঘটনাকেও তাঁরা নিন্দা করবেন না। এইচ এম এস, এইচ এম পি বা বি এম এস-এর আচরণ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনতা সরকারের যে কোন ব্যবস্থাকে নিন্দা করতে এঁরা দ্বিধা করেন না। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মনে এ আই টি ইউ সি নেতৃত্বের সততা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে।

সি আই টি ইউ যে এইসব অসুবিধা এবং বাধাগুলি অতিক্রম করতে বা যুক্ত কার্যক্রম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে, তার কারণ এই যে আমরা শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি নিয়ে লাগাতার প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছি।

ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

কমরেডগণ, আগামী দিনগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং ঐকাবদ্ধ আন্দোলনের সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি হবে কারণ জনতা সরকারের অর্থনৈতিক নীতি কংগ্রেস সরকার অনুসৃত নীতি থেকে কোন দিক দিয়েই ভিন্ন নয়।

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতিগুলির মূল এইসব মৌলিক অর্থনৈতিক

নীতিসমূহের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে জরুরী অবস্থা চলাকালে যেসব বাড়াবাড়ি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেগুলি নাকচ করার ক্ষেত্রে প্রথম কয়েকমাস জনতা সরকার কিছুটা উদার মনোভাব দেখিয়েছে। কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য বা কেন্দ্রের জনতা সরকার সেগুলি দমনের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে।

উত্তরপ্রদেশের চিত্র দেখুন। পন্থনগরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে। অনুরূপভাবে গুলি চলেছে হরিদ্বারে BHEL (ভেল) কারখানার শ্রমিকদের উপর। কানপুরের স্বদেশী মিলের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী প্রাপ্য মজুরী দেওয়ার মত সাধারণ দাবি করায় তাদের উপরও গুলি চালানো হয়েছে। সাইকেল স্ট্যাণ্ড, ক্যান্টিন ইত্যাদি সামান্য দাবি চাওয়ার ফলে গাজিয়াবাদের শ্রমিকদের উপর মালিকশ্রেণীর গুণ্ডাবাহিনী গুলি চালিয়েছে। হাজার হাজার ধর্মঘটী বিদ্যুৎকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ১ বছরে ১১ বার শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে।

সি আই টি ইউ-র পতাকা নিয়ে মিছিল করায় এবং মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলায় ফরিদাবাদের শ্রমিকদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য তাদের উপর হরিয়ানা সরকারের পুলিশ নির্যাতন শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ গত ৭ বছর ধরে বাক্সবন্দী করে রাখা হয়েছে। আর এখন ফরিয়াবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা যে বেতন পায় তা ওয়েজ বোর্ডের দ্বারা প্রস্তাবিত মজুরির অর্ধেক মাত্র। মলিকরা চাইলেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। হরিয়ানার শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের দাবিগুলি সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে এক কলমের খোঁচায় মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেন।

মধ্যপ্রদেশের বিদ্যুৎশ্রমিকরা ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সরকার বিনাবিচারে গ্রেপ্তারের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। সেই অর্ডিন্যান্স 'মিনিমিসা' নামে খ্যাত।

ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় বায়লা ডিলাতে শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

বিহারে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলাকালে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় বিহার সরকার শ্রমিকদের উপর গুলি চালিয়েছে।

রাজস্থানের রাওয়াত ভাতায় এ্যাটমিক পাওয়ার প্ল্যানেটের শ্রমিকরা যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়েছিল। দাবিগুলি ছিল— ১) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মীদের উপর আরোপিত শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, ২) একতরফাভাবে প্রত্যাহৃত প্রজেক্ট ভাতা প্রদান এবং ৩) প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার। এই দাবিগুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুসৃত শ্রমনীতির চরিত্র যে চরম শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী তা দেখিয়ে দিচ্ছে। বহু মাস ধরে কর্তৃপক্ষ আলোচনা করতেই সম্মত হয়নি। এর ফলে শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হন, তখন প্রধানমন্ত্রী আলোচনার পূর্বসর্ত হিসেবে ধর্মঘট প্রত্যাহারের দাবি জানান। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা আন্দোলনে অনড় থাকেন। এরপর রাজস্থানের শ্রমমন্ত্রী তাঁর নিজের পক্ষে, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এ্যাকশন কমিটির নিকট লিখিত এক চিঠিতে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের কাজে যোগ-দান করতে দেওয়া হবে এবং অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করা হবে।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর রাজস্থান সরকার যখন মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে চান তখন কেন্দ্রীয় সরকার চাপ দিয়ে তাদের নিরস্ত করেন।

কয়েক মাস পরে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক রাওয়াত ভাতা পরিদর্শন করেন। সেখানে আলাপ-আলোচনার পর শ্রমমন্ত্রী কর্মীদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু তারপর চার মাস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন না। এদিকে আদালতে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খারিজ হয়ে যায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে অভিযোগগুলি ছিল সম্পূর্ণ অসত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কাজে পুনর্বহাল করা হয় না। শেষ পর্যন্ত বহু চাপাচাপির পর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ১৩ই মার্চ '৭৯ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক ডেকেছেন।

দীর্ঘসূত্রী কৌশলে বিরোধ মীমাংসায়, ক্ষেত্রী তামাখনির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অকারণ কালক্ষেপের মত অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

বেশীর ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় স্থায়ী শ্রমিকদের ঠিকাদারদের কাছে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা করার সময় এদের মজুরীহারও ঠিক করে দওয়া হয়না! রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কর্তৃপক্ষ ঠিকা শ্রমিক আইনের ধার ধারেন

না। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী সুরজিৎ সিং বারনালা সংসদে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না যে তিনি ফুড কর্পোরেশনে মালপত্র নামানো-ওঠানোর ক্ষেত্রে ঠিকাদারী ব্যবস্থা বিলোপ করবেন না এই কারণে নয় যে ঐ কাজগুলি স্থায়ী চরিত্রের নয়, বরং এই কারণে যে ঠিকাদারী প্রথায় কম খরচ হয়। সরকার নিজেই যখন এই নগ্ন শোষণের উপর নির্ভর করেন, তখন তাদের কাছ থেকে এই আশা কি করে করা যেতে পারে যে ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থায় ঠিকাদারী প্রথার বিরুদ্ধে তারা হস্তক্ষেপ করবেন ?

২ বছর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও সরকার তার বোনাস নীতি ঠিক করেনি। প্রতি বছরই দেশের সর্বত্র বোনাসের দাবিতে বিভিন্ন শিল্পে ধর্মঘট শুরু হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে একটি করে অর্ডিন্যান্স করে ৮'৩৩ শতাংশ ন্যূনতম বোনাস প্রদানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হচ্ছে।

এতদিনে হয়তো বেতন সংকোচনমূলক কোন নীতি ঘোষিত হয়ে যেত। কিন্তু দেশব্যাপী ধর্মঘটের সম্মুখীন হতে হবে, এই আশঙ্কাতেই তা হয়নি। কিন্তু অপচেষ্টার ক্ষান্তি নেই। এ ব্যাপারে বি পি ই-র ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। রেলকর্মীদের ক্ষেত্রেও এক নীতি অনুসৃত হচ্ছে। যে ছয়টি অতি গরুত্বপূর্ণ দাবির ভিত্তিতে রেল কর্মীরা ১৯৭৪ সনে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার মীমাংসা আজ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়েছে। লক্ষণীয় যে জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে ঐ ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল, তিনি আজ একজন অতি প্রভাবশালী মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন।

মাননীয় মন্ত্রীরা প্রায়ই শোনান যে রেলকর্মীদের বোনাসের বিষয় বিবেচনার জন্য একটি ক্যাবিনেট সাবকমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ সাব-কমিটি আজ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।

শ্রমিকদের রক্ত শোষণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রেল কর্তৃপক্ষ চরমতম অপরাধী। রেল শ্রমিকদের শতকরা ২০ ভাগই হচ্ছে ক্যাজুয়াল শ্রমিক। এদের মজুরীহার নির্ধারিত হয় যে যে অঞ্চলে এরা কাজ করে, সেই সেই অঞ্চলে কৃষি মজুরদের প্রচলিত মজুরীহার সম্পর্কে জেলা কলেকটর যে রিপোর্ট দেন তার ভিত্তিতে। বৃটিশ আমলেও এত বিরাট সংখ্যক রেলকর্মীকে ক্যাজুয়াল করে রাখা হতো না।

সকলেই জানেন, ১৯৭৩ সনে লোকো-রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে

রেলের লোক রানিং কর্মী এক শক্তিশালী ধর্মঘট করেছিলেন। ঐ ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে লোকো-রানিং স্টাফদের ১০ ঘন্টা কাজের দিন চালু করা হবে বলে এক চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু রেলমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ঐ চুক্তি কার্যকরী হয় নি। ঐ চুক্তি অনুযায়ী অভিযোগ মিটাবার যে সংস্থা অভিযোগ (Grievance) কমিটি গঠিত হয়েছিল, জরুরী অবস্থার সময় তা বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু জনতা সরকারও আজ পর্যন্ত ঐ সংস্থা পুনর্গঠন করে নি। ফলে এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে লোকো-রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ জানাবারই কোন সুযোগ নেই। অন্য-দিকে কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্দয়ভাবে চাপানো হচ্ছে।

দেশের সর্বত্র রেল কর্মীরা এক বিস্ফোরক অবস্থায় পৌঁছেছে। এ আই আর এফ একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের জন্য সমস্ত ইউনিয়নের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। এন এফ আই আর.-এর স্ট্রাইকে ব্যালট পাশের ঘটনা স্ফুলিংগ হিসেবে কাজ করেছে।

সম্প্রতি যে রেল বাজেট পেশ হয়েছে তাতেও ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। অন্যদিকে সিজন টিকিটের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে বড় বড় শহরের লক্ষ লক্ষ নিত্য যাত্রী ও নিত্য মাল-বহনকারীদের উপর প্রচন্ড বোঝা চাপানো হয়েছে। তা ছাড়া সর্বক্ষেত্রে মাল বহনের ভাড়া শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধির ফলে সব জিনিষের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে এল. আই. সি. কর্মীদের বোনাস চুক্তি বাতিল করে যে আইন প্রণীত হয়েছিল, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও জনতা সরকার ঐ কুখ্যাত আইন আজ পর্যন্ত বাতিল করে নি। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট ঐ আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হলে জনতা সরকার এ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে কর্মীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার স্বপক্ষে একটিও যুক্তি দেখাতে পারে নি। সুপ্রিম কোর্ট ঐ আইনকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে রায় দিয়েছে যার ফলে ঐ চুক্তি পুনর্বহাল করতে হয়েছে। এদিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে অর্থমন্ত্রকের নির্দেশে এল.আই.সি. কর্তৃপক্ষ. চাকুরীর নিয়মাবলী: (Service Rules রাতারাতি সংশোধন করে ঘোষণা দিয়েছে যে এল আই সি কর্মীরা বোনাস পাওয়ার যোগ্য নয়।

এই সমস্ত শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী নীতিসমূহেরই চরম পরিণতি কুখ্যাত শ্রম সম্পর্ক বিল।

বাজেট ও পর্বত প্রমাণ করের বোঝা

সংসদে ১৯৭৮-৭৯ সনের জন্য যে বাজেট পেশ হয়েছে তাতে ঐ সব শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহের উৎসস্বরূপ মৌলিক নীতিগুলি থেকে এক পা-ও পশ্চাদপসরণ ঘটে নি। অন্যদিকে, মানুষের উপর নতুন বোঝা চাপানোর সমস্ত পূর্ব নজির ম্লান হয়ে গেছে। নজিরবিহীন ৬০০ কোটি টাকার নতুন করের বোঝা এবং ১৩০০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে।

সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ প্রভৃতিকে বিলাসদ্রব্য আখ্যা দিয়ে সে-সবের উপর অতিরিক্ত আবগারী শুল্ক চাপানো হয়েছে। কেরোসিন, দিয়াশলাই প্রভৃতি গরীব মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের উপরও করের বোঝা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তালিকায় উল্লেখ নেই এমন সব দ্রব্যের উপরও সাধারণ-ভাবে অতিরিক্ত শতকরা পাঁচভাগ আবগারী শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর অত্যধিক কর বৃদ্ধির ফলে বাসভাড়া এবং মাল পরিবহনের ব্যয় বাড়বে। ফলে দ্রব্যমূল্য আরও গগনচুম্বী হবে। রাসায়নিক সার এবং সেচ পাম্পে ব্যবহার করা হয় যে হালকা ডিজেল তার উপর থেকে আবগারী শুল্ক হ্রাসের ঘটনা এবং কুটীর শিল্পাজত তামাকের উপর থেকে আবগারী শুল্ক তুলে নেওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এর ফলে প্রধানতঃ সামন্ত প্রভুরাই লাভবান হবে। কৃষকশ্রেণীর উপর এর সুফল বর্ত্তাতে খুব সামান্যই। আঁখ, তুলা, পাট প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসলের দাম যে গত বছর পড়ে গিয়েছিল তা সুবিদিত। খাদ্যশস্য ফলনকারী কৃষকরাও মহাজনদের খপ্পরে পড়ে, সরকারের দ্বারা নির্দিষ্ট সহায়ক মূল্য যেটা মেটেই লাভজনক নয়, তার থেকে অনেক কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ সহায়ক মূল্য নামেই আছে। এই দামে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ব্যাপক-ভাবে ফসল ক্রয় করার সরকারী ব্যবস্থা নেই। কৃষকশ্রেণীর বিরাট অংশ এর ফলে ধ্বংসোন্মুখ।

কৃষকদের এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা বাজেটে নেই। কৃষিমজুরের ভবিষ্যতও অন্ধকার। ১৯৭৮ সালে পাইকারী দরের সূচক শতকরা একভাগ বৃদ্ধি পেলে ১৯৭৮-৭৯ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় পাইকারী মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য গর্ব করা হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক কৃষিজাত দ্রব্যের দাম পড়ে যাচ্ছে, সেখানে এই গড়ের অর্থ কি দাঁড়ায়? একমাত্র এটাই বোঝায় যে পাইকারী দরে শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলেই ঘটেছে। অন্যদিকে ঐ সময়ে ক্রেতা মূল্য-সূচক শতকরা ৪'৮ ভাগ বেড়েছে।

এইসব থেকে পরিষ্কার যে গ্রামাঞ্চলেই হোক বা শহরাঞ্চলেই হোক সাধারণ ক্রেতা এবং উৎপাদক, উভয়েই শোষিত হচ্ছে। এইভাবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে শিল্পের অগ্রগতির হার যে আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালে ৩.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে এতে আশ্চার্য হওয়ার কিছু নেই।

বাজেটে আরও করের বোঝা বৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে। যার ফলে শিল্পে অনগ্রসরতা আরও বাড়বে। স্পষ্টতই আমরা যুগপৎ (অর্থনৈতিক) বদ্ধাবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতির যুগে প্রবেশ করেছি।

বহুজাতিক সংস্থায় অনুপ্রবেশের বিপদ

বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান হারে সহযোগিতার চুক্তি এবং এ দেশে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ওদের প্রতি উদার আহ্বান শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির সুবিধার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার নিয়মাবলী সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হচ্ছে। কারণ বিশ্বব্যাংক ভারতীয় বাজারে বিদেশী মূলধনের আরও অবাধ বিচরণ দাবি করেছে। এতে উৎসাহিত হয়ে বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আরও সুবিধা দাবি করছে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য কাউন্সিলের মার্কিন যুগ্ম-সভাপতি শ্রীফ্রাম্যান প্রকাশ্যেই জর্জ ফার্নাণ্ডেজের সমালোচনা করেছেন বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠীর উপর তাঁর (ফার্নাণ্ডেজের) নরম গরম মন্তব্য বর্ষণের জন্য। আটলান্টিকের তীরবর্তী কোন দেশের বুকের উপর দাঁড়িয়ে সেই দেশের কোন মন্ত্রীর প্রতি তিনি এই ধরনের মন্তব্য করতে সাহসী হতেন না। কিন্তু ফ্রীম্যান এ দেশের বুকের উপর দাঁড়িয়ে মালিকানার সুরেই দাবী করে গেলেন যে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা পরিচালিত ওষুধ কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় জনগণকে আরও লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। তিনি আরও দাবী করেছেন যে ভারতীয় সংস্থা-গুলিকেও বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাধ্য করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে আমেরিকা নিজের দেশে মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য রক্ষাকবচ আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। সেখানে ভারত বা অন্য কোন অনুন্নত দেশ থেকে আমদানীর ক্ষেত্রে দরদামে বাধানিষেধ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু ভারত-মার্কিন বাণিজ্য কাউন্সিলের ভারতীয় প্রতিনিধি অতি সহজেই নিজের দেশের সরকারের কাছে সুপারিশ করলেন যে পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং FERA-র বিধিনিষেধগুলিকে শিথিল করতে

হবে। এইসব ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ভারতীয় ওষুধ উদ্যোগের স্বার্থের প্রতি এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ব্যাপারে বিবেক দংশনের কোন অনুভূতি নেই। প্রশ্ন জাগবে, ভারতীয় বণিককুল এ রকম করছেন ? উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। এঁরা বৈদেশিক পুঁজির সঙ্গে অন্যদেশে অনুপ্রবেশ করতে আগ্রহী। সেইসব দেশে বিদেশী পুঁজিও অধীনস্ত ঠিকা বা কোন ধরনের এজেন্সি পার্টনারশিপ পাওয়ার জন্য এরা উদগ্রীব।

শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ কোকা-কোলা কোম্পানীকে পদাঘাতে বিতাড়িত করেছেন বলে খুব গর্ব করছিলেন। তার পরমুহূর্তেই কিন্তু বহুজাতিক সংস্থার সংগে সহযোগিতা চুক্তি মঞ্জুর করতে তাঁর বাধে নি। শিল্পমন্ত্রীর এই রকম দু-মুখো দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থরক্ষার জন্য জনতা সরকারের আগ্রহের ফলেই ফ্রীম্যান সরকারের সমালোচনা করতে এবং বিদেশী পুঁজির জন্য দরজা খুলে দেওয়ার দাবী করতে সাহসী হয়েছেন।

সরকারের এই দুর্বল মনোভাবের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা BHEL এত তাড়াতাড়ি পশ্চিম জার্মানীর সিমেন্স কোম্পানীর সংগে এক মারাত্মক সহযোগিতার চুক্তি করে বসেছে। এই চুক্তির ফলে ভেল গত ২৫ বছর ধরে যেসব বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরী করছে, কারিগরী কুশলতার নামে সেগুলি এখন সিমেন্স কোম্পানীর সংগে সহযোগিতায় তৈরী হবে। প্রস্তাবিত এই চুক্তিতে সিমেন্স কোম্পানী কারীগরী, আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যতদূর সম্ভব আদায় করে নিয়েছে। অন্যদিকে, সিমেন্স থেকে BHEL সংস্থায় কোনও উল্লেখযোগ্য কৃৎকৌশল বদলির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চুক্তিতে উল্লেখ নেই।

এই চুক্তি কার্যকরী হলে, বিদ্যুতের উৎপাদন-ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাবে শুধু নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোপুরি সিমেন্সের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

এই চুক্তির ফলে শুধু এই শিল্পেই নয়, অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেও দেশীয় কারিগরী কৃৎকৌশল উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সংগে সংগে দেশকে কারিগরী কৃৎকৌশলের জন্য স্থায়ীভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল করে তুলবে। আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে দাবী করছি যে এই চুক্তি বাতিল করা হোক এবং এর জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হোক।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই বিশ্ব ব্যাংকের চাপের কাছে মাথা নত করা এবং বহুবিধ সংস্থাগুলিকে বেশী বেশী সুযোগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, যে জনতা সরকার গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে, তারাই দেশের অর্থনীতিতে বহুজাতিক সংস্থার বেশী বেশী অনুপ্রবেশের জন্য ওকালতি করছে। একটি বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা মাত্র দু'তিন হাজার শ্রমিক নিয়ে একটি ছয় লক্ষ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ইস্পাত কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা একটি এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়েছিল। যদিও বোকারো ইস্পাত কারখানার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া কারিগরী ও অন্যান্য সবরকম সাহায্য দিচ্ছে, তা সত্ত্বে ঐ কারখানার জন্য পশ্চিম জার্মান ও জাপানী বহুজাতিক সংস্থার সহযোগিতা আমদানীর জন্য কথাবার্তা চলছিল। এ ছাড়াও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এদেশে বড় বড় কারখানা নির্মাণ করবে এবং সেসব কারখানার সমস্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করা হবে। বলা হয়ে থাকে যে এতে নাকি ভারত নিঃখরচায় বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সুযোগ পাবে এবং চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে। আসলে এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একই সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণ এবং বিদেশী বাজার লুণ্ঠন করা।

ইতিমধ্যেই বহুজাতিক সংস্থাগুলি আমাদের জনগণের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। তারা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকার করতে বা সরকারের নিয়মকানুন বা জনমত মেনে চলতে বেপরোয়াভাবে অস্বীকার করছে। ফাইজার গ্লাক্সো প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থাগুলি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং শ্রমিকদের অনাহারে রাখার জন্য লক-আউট ঘোষণা করছে।

অন্যদিকে এই বহুজাতিক ভেষজ সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। জীবনদায়ী ওষুধগুলি এখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

ইলেকট্রনিক কমিশনের চেয়ারম্যান স্বদেশী ইলেকট্রনিক শিল্পের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে এবং এই শিল্পে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন বলে জনতা সরকার ঐ কমিশন পুনর্গঠন করেছে। ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানগম্যি এদেশে যথেষ্ট নেই তা নয়, এ ছাড়া এই শিল্পের কারিগরী উন্নতিতে সক্ষম এমন বহু ইঞ্জিনিয়ারও এদেশে আছেন। ইলেকট্রনিক কমিশন পুনর্গঠনের অর্থ হচ্ছে এই শিল্পে বহুজাতিক সংস্থার অনু-

প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য ঐ কমিশন যে সুপারিশ করেছিল তা নস্যাৎ করা। সিমেন্স কোম্পানীরই শাখা সিমেন্স ইণ্ডিয়াকে লাইসেন্স মঞ্জুরের ঘটনাই বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রতি জনতা সরকারের বদান্যতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই লাইসেন্স বলে ঐ সংস্থা দাতা লগার উৎপাদন করবে। ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন এই জিনিষ সবে উৎপাদন করতে শুরু করেছে, যে কারণে ইলেকট্রনিক কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীবিজয়াকার সিমেন্স ইণ্ডিয়াকে ঐ লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ঐ প্রতিবাদ উপেক্ষা করা হয়েছে। বাজেটে ইলেকট্রনিক শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর যে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে তা হচ্ছে এই শিল্পের ছোট ছোট শাখার মৃত্যুপরোয়ানা। এর ফলে লাভবান হবে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং সেইসব বড় বড় সংস্থা যারা বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা।

রাসায়নিক সার শিল্পে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ যেসব দেশীয় সংস্থা এই সার তৈরী করে তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করবে। দৈনিক ৯ হাজার টন সার উৎপাদনে সক্ষম কারখানা ভারতেই এখন তৈরী হতে পারে। কিন্তু দৈনিক ১৩ হাজার টন উৎপাদন করতে পারলে উৎপাদন-ব্যয় কম হবে এই অজুহাতে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থা থেকে ঐ ধরনের বড় প্ল্যান্ট আমদানী করে বম্বে হাইয়ের গ্যাস থেকে রাসায়নিক সার উৎপন্ন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

কমরেডগণ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের তুলনায় বহুজাতিক সংস্থার প্রতি কোন কোন মহলের পক্ষপাতিত্বের এক বিপজ্জনক ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের দেশে ভারী শিল্পের ভিত তৈরী করতে প্রভূত সাহায্য করেছে। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী কব্জা অনেকটা শিথিল হয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্কে চিঁড় ধরাতে উদ্যত হয়, তাহলে সেই চক্রান্ত পর্যুদস্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুনিবিড় করার দাবীতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ভারতীয় অর্থনীতিতে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সি আই টি ইউ-র ইউনিয়নগুলি, তার রাজ্য কমিটি বা অন্যান্য সংগঠন যে খুব সজাগ সে দাবী করা চলে না। গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, সর্বোপরি দেশের অর্থনীতি ও স্বাধীনতার এই বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে আমরা সজাগ করতে পেরেছি সে দাবীও করা চলে না। বহুজাতিক সংস্থায়

অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এবং ওদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিপজ্জনক খেলার অবসানকল্পে আমাদের সমস্বরে সোচ্চার হওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত BHEL-SIEMENS চুক্তির মুখোস খুলে পড়ায়, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরী-বিশারদ মহলে এই চুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফলে এই প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত করার উদ্যোগ নিলে তা এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বহুজাতিক সংস্থা এ দেশে এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশে শিল্পে অগ্রগতি ঘটাতে চায় বলে যে অপপ্রচার চলছে তার মুখোস খুলে দিতে হবে। ধনতন্ত্র এখন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সংকট প্রতিদিনই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তাই ধনিকশ্রেণী সেই সংকটের বোঝা নতুন নতুন উপায়ে অনুন্নত দেশগুলির উপর এবং নিজ দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে।

বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মঘট এই সংকটের তীব্রতা প্রকাশ করছে। বৃটেনের কথাই ধরা যাক। এ বছরই জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে এক অভূতপূর্ব ধর্মঘটের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি সংস্থায় ধর্মঘট—মায় সরকারী কর্মচারীরাও ধর্মঘটে নেমেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে যাঁরাই সংগ্রাম করছেন, সেইসব বীর শ্রমিকদের অভিবাদন জানাই।

সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

প্রতিদিনকার অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া নিয়েই কেবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে না, সম্প্রতিকালে সরকারের যেসব আইন শ্রমিকদের স্বার্থকে সরাসরি আঘাত করছে, তা নিয়েও সংগ্রাম হচ্ছে। কিন্তু আজ এমন সময় এসেছে যে বিকল্প অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক নীতি প্রণয়ন করার দাবীতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সি. আই. টি. ইউ-কে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমূল ভূমি সংস্কার, বিদেশী এবং একচেটে পুঁজি অধিগ্রহণ, বিদেশী ঋণ পরিশোধ স্থগিত, বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান সহযোগিতা বন্ধ, এবং দেশের কারিগরী কৃৎকৌশল ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি—এইসব দাবীতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়কে বারবার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে নিয়ে আসার দায়িত্ব

সি আই টি ইউ-কে গ্রহণ করতে হবে। এটা বোঝা দরকার যে বহুজাতিক সংস্থার দ্রুত অনুপ্রবেশ গণতন্ত্রের মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করবে এবং এর ফলে দেশে ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দেবে।

শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করছেন যে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিগুলির মধ্যেই মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। জীবনমান এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই চেতনা জাগাবার দায়িত্ব সি আই টি ইউ-কে নিতে হবে, যে নীতিসমূহের মৌলিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। এ-ও বুঝতে হবে যে শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। অপরদিকে প্রচলিত জনবিরোধী নীতিসমূহ অনুসৃত হতে থাকলে তা দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা এবং বেকারীকে আরও তীব্র করে তুলবে।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের চেতনায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করি, তাদের পক্ষে প্রচলিত জনবিরোধী নীতিগুলির মৌলিক পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সি আই টি ইউ-র স্বাধীন এবং ব্যাপক কর্মপ্রয়াসই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। একে প্রয়োগ করে, মৌলিক অর্থনৈতিক নীতির জন্য সি আই টি ইউ ইউনিয়নসমূহের লাগাতার স্বাধীন উদ্যোগই একমাত্র এইসব বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এই দাবীগুলি বাস্তব জীবন এবং শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়েই শ্রেণী-শক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস ঘটবে, যার মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করে দারিদ্র্য ও বেকারী দূর করে দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম যে প্রকৃত বাম ও গণ-তান্ত্রিক শক্তি তার বিকাশ ঘটবে।

কমরেডগণ, বিগত সম্মেলনের পরবর্তীকালে আমাদের সংগঠকরা এবং শ্রমিকশ্রেণী যে সুতীব্র নির্যাতন সহ্য করেছে তার নজির নেই। বহু কমরেড পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, কারান্তরালে জীবন দিয়েছেন আরও বহু কমরেড, কারান্তরালে অনেকের উপর চলেছে অবর্ণনীয় অত্যাচার। বহু রাজ্যে আমাদের কর্মীরা শাসকদলগুলির দ্বারা সংগঠিত আধা সামরিক বাহিনী এবং

মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তামিলনাড়ুতেও এ আই ডি এম কে সরকার সি আই টি ইউ-কেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। আমাদের কর্মীদের উপর পুলিশী নির্যাতনই শুধু চলছে না, শ্বেত ব্রিগেড নামে যে ভাড়াটে বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে, তারাও আমাদের কমরেড এবং সাধারণ অনুগামীদের উপর আক্রমণ হানছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তিন মাসের মধ্যে সমস্ত ধর্মঘট শেষ করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। আমরা সেইসব বীর শহীদ ও সংগ্রামীদের অভিবাদন জানাই।

অন্যান্য রাজ্যে শ্রমিক নির্যাতনের যে চিত্র তার বিপরীত চিত্র দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়, যেখানে গত দেড় বছরের মধ্যে একজন শ্রমিকও গ্রেপ্তার হননি বা ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার একটি ঘটনাও ঘটে নি। শ্রমিক ধর্মঘটে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঐ দুই রাজ্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুতাশিল্পের শ্রমিকদের দাবীদাওয়ার অত্যন্ত অনুকূল মীমাংসার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ধর্মঘটের হুমকির সামনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মালিকরা শ্রমিক-পিছু মাসিক ৬৫ টাকা মজুরী-বৃদ্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্প সহ আরও বহু সংস্থার শ্রমিকরা অনুরূপ মীমাংসার ফলে লাভবান হয়েছেন। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নামিয়ে আনেন না; উল্টো ঘোষণা দেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কমরেডগণ, আজ যদি সি আই টি ইউ সমগ্র দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে একটি প্রধান শক্তি হয়ে দেখা দিয়ে থাকে, শ্রমিকগণ তাদের স্বার্থ-রক্ষার সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সংগঠন বলে মনে করেন, তবে সেটা সরকার ও মালিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ঘটেনি। তার বর্তমান প্রতিষ্ঠার কারণ এই যে জন্মলগ্ন থেকেই সে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, শ্রেণী-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতির পথপ্রদর্শক, এবং ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অবিচল প্রবক্তা। নির্যাতন ও আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় সে বিশুদ্ধি লাভ করেছে।

সি আই টি ইউ-র বৃদ্ধি এবং আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার প্রতিষ্ঠা লাভ আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে।

১৯৭৭ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা দ্বারা আহুত বর্ণবৈষম্য বিরোধী সম্মেলনে সি আই টি ইউ-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষ্যে আমি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইটালীতেও গিয়েছিলাম। সে সময় ব্রিটিশ

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কতিপয় নেতা, ফ্রান্স ও ইটালীর ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা যথাক্রমে সি জি টি এবং সি জি আই এল-এর সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে।

WFTU এতদিন আমাদের এড়িয়ে চলছিল, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে অনুষ্ঠিত তাদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে আমাদের একজন দর্শক প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিল। সাধারণ সম্পাদক ঐ সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। একজন দর্শক প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও সম্মেলনের সমস্ত আলোচনাতেই, এমনকি বিষয় নির্বাচনী কমিটির আলোচনাতেও তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সংযোজিত হয়েছিল। ঐ সম্মেলন চলাকালে সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য দেশের অনেকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

WFTU-র অন্তর্ভুক্ত বহু ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকে আমরা এখন আমন্ত্রণ পাচ্ছি এবং সেইসব সভায় আমাদের বহু প্রতিনিধি ইতিমধ্যে অংশ-গ্রহণও করেছেন।

আমাদের দেশের কয়লাখনিগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আই এল ও একটি টীম পাঠিয়েছিল। ঐ টীম সি আই টি ইউ অফিসে এসেছিল এবং আমাদের সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ঐ টীমের প্রতি-নিধিদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং পরে আমরা খবর পেয়েছি যে শ্রমদপ্তরের সঙ্গে আই এল ও-র টীমের আলোচনার সময় সি আই টি ইউ-র দ্বারা পরিবেশিত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় শ্রমদপ্তর খুবই বিব্রত বোধ করেছে শুধু নয়, সেইসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাবও শ্রমদপ্তর দিতে পারে নি।

ব্রিটিশ টি ইউ-র দু'জন কর্মকর্তা আমাদের দপ্তরে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিষদ আলোচনা হয়। তাঁরা আমাদের সঙ্গে সৌভ্রাত্রিত্ব-মূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং উভয়ের মধ্যে পত্র-পত্রিকা বিনিময়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের সংগঠন শ্রমিক-শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু আমরা তাদের স্বার্থকে দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করে চলেছি, সেইহেতু আমাদের সংগঠন বাড়তে বাধ্য। এইসব ঘটনা সি আই টি ইউ জন্মলগ্ন থেকে যে নীতি অনুসরণ করে আসছে তার যথার্থতা প্রমাণ করছে।

আসুন আমরা ঐক্য এবং ঐক বদ্ধ সংগ্রামের পতাকাকে আরও উর্ধ্বে তুলে ধরি এবং এই সংগ্রামগুলিকে বিকল্প নীতির দাবীতে সংগ্রামের উচ্চতর ধাপে উন্নীত করি। আমরা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে সংঘবদ্ধ করবই।